স্রষ্টার সৃষ্টি

অপার বিস্ময় !

স্রষ্টার সৃষ্টি
অপার বিস্ময়!

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

সম্পাদক
মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন

নির্বাহি সম্পাদক
মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

সম্পাদনা সহযোগী
মু. আতাউর রহমান সরকার
মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
ডা. সাইদুর রহমান রতন
ডা. মো: বেলায়েত হোসাইন আরিফ
ডা. মো: মশিউর রহমান
ইঞ্জিনিয়ার মো: সিরাজুল ইসলাম
রেদওয়ান বিন আব্দুল বাতেন
স ম আব্দুল্যাহ আল মামুন

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

প্রকাশনায়
আই সি এস পাবলিকেশন
৪৮/১ -এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪০

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০৯
তৃতীয় প্রকাশ ঃ মে ২০১১

নির্ধারিত মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

নতুন শতাব্দী, নতুন পৃথিবী, নতুন সম্ভাবনা, নতুন চ্যালেঞ্জ।

মত আর মতবাদের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব ধরণীর ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বিদ্যমান।

'ইসলাম'- একটি জীবনপদ্ধতি; সঙ্কীর্ণ অর্থে নিছক কোন ধর্ম নয়। আর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এই ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং বাস্তবতার নিরিখে যাচাই বাছাইয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন সমাজের একটি অংশের তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী ও গবেষক।

আলোচ্য বইটি আজ থেকে প্রায় দেড় সহস্র বছর আগে নাজিলকৃত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে নেয়া বিভিন্ন চাক্ষুষ দলিল, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের যুগান্তকারী সব আবিষ্কার ও গবেষণা, মানবদেহের অগণিত রহস্যের উন্মোচন, মানব সৃষ্টিপদ্ধতির সচিত্র আলেখ্য, তথাকথিত Darwinism-এর অসারতা প্রমাণের মাধ্যমে শুধুমাত্র একজন মহাশক্তিধর, মহাকুশলী স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর নিখুঁত সৃষ্টিতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ইসলামকে একটি যুগোপযোগী 'জীবনপদ্ধতি' হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ এনেছে।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চশিক্ষায় ভর্তি প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার গাইডলাইন হিসেবেও সহায়ক হবে এই বইটি।

বইটির পরিপূর্ণ রূপদানে আদ্যন্ত মেধা, শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ডা. সিঞ্চন, সাঈদ, মাহিদ, জাকিউল, মেফতাহ, মাইনুলসহ আরো অনেকেই। হৃদয়সিক্ত শুভেচ্ছা তাদের প্রতি।

বইটি মেধাবী তরুণ-তরুণীদের জীবনপ্রবাহের পথচলার সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে মাইলফলক হয়ে থাকুক। –এই কামনায়।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সবুজ শ্যামলিমায় মনোমুগ্ধকর ছবির মতো ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। জাতির সোনালি দিনের স্বপ্নিল আকাশ গড়ার প্রত্যয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন একদল আত্মপ্রত্যয়ী, সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজ।

তরুণ সমাজের বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রতি বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক বিষয়ে আর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার পরিচয় প্রদানের নিমিত্তেই আমাদের এ প্রকাশনা।

বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায়ই যা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়, এর কোথাও বিশ্বস্রষ্টার উল্লেখ বা ঐশী জ্ঞানের কোনো চর্চা হয় না। এ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেও কেউই Divine guidance-এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে যারা এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় বা পারিবারিক প্রভাবে সে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরকে এ শিক্ষা দেয় না।

ইউরোপে রেনেসাঁর যুদ্ধে বিজ্ঞানে উন্নতির পথে খ্রিস্টধর্ম বাধা সৃষ্টি করায় সে ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়, সেটি অবগত হয়ে অনেক শিক্ষিত মানুষ ইসলামকেও তেমনি এক ধর্ম মনে করেন। ফ্রান্সের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. মরিস বুকাইলি "The Bible, The Quran and Science" নামক বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেল মানব রচিত বলেই বিজ্ঞানের সাথে বাইবেলের বিরোধ রয়েছে। আর আল কুরআন আল্লাহর বাণী বলেই বিজ্ঞানসম্মত।

আমরা অত্র গ্রন্থে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যক বাণীর সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইকরা শব্দটি দিয়েই শুরু হয়েছিলো ইসলামের যাত্রা, যে জীবনব্যবস্থায় বলা হয়েছে, "এক ঘণ্টা জ্ঞান অর্জন করা সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।" বিশ্বস্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের অন্যূন সাত শতাধিক আয়াতে মানবজাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং জ্ঞান গবেষণার নতুন নতুন অভিধার তালাশে মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীরা পৃথিবীর সামনে জ্বালালেন এমনই দীপ্ত শিখা যা সেই নবম-দশম শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরিক্রমায় যুক্ত করলো এক অনন্য মাইলফলক। আধুনিক বিজ্ঞান শুধু চমকপ্রদ আবিষ্কারের জন্যই নয়, তার নিজের অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী। Robert Briffault দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন : "Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to that of Arabs does not consist in startling discoveries or revolutionary theories; Science owes a great deal more to the Arab culture, it owes its existence."

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। কুরআন শাশ্বত বিধান। বিজ্ঞান ও ধর্ম পৃথক জিনিস, যদি উভয়ের পথ দু'দিকে বেঁকে যায়। কিন্তু আমরা দেখি এক সময়ে বিজ্ঞান যা বলে, পরে তা বদলে যেতে পারে। We have seen that the new self consciousness of science has resulted in the

recognition that its claims were greatly exaggerated." [Limitations of Science. P-194]. একইভাবে আমরা Science and the Modern World গ্রন্থের লেখক Whitehead-এর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি, "All our ideas will be on wrong perspective if we think that this recurring perplexity was confined to controversies religion was always wrong and that science was always rigth. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন, "Science without religion is lame and religion without science is blind." মুসলিম জাতি তাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিল পবিত্র কুরআনের বলেই। এ গ্রন্থই ছিল তাদের মূল প্রাণশক্তি "We must not be surprised to find the Quran regarded as the fountain head of all the sciences. Every subjct connected with heaven of earth, human life, commerce and various trades are occasionally touched upon and this gave ripe to the production of numerous monographs forming commentaries on part of the holy book. [Dr. Hartnig Herschfeld : New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran. (1906).]

বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। ইবনে সিনা, আল রাজি, আবুল কাশেম জাহারাভি, ইবনুল হাইছাম, জারকালি, জাবির বিন হাইয়ান, মুসা আল খারেজমি, ইবনে নাফিস, প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও রচনাবলি সেইদিনও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পাঠ্য ছিল। ইবনে সিনার অনবদ্য লেখনী "Al Qanun " has remained a medical Bible for a longer period than other work `` (William Qanu : Evolution of Modern Science). আবুল কাসেম জাহারাভির আর তাসরিফ সম্পর্কে ব্রিটানিকা উল্লেখ করেছে" Al tasrif stood for nearly 500 Years as the leading text book on surgery in Europe. Preferred for its conecept lucidity even to the works of the classic Greek medical authority Galen." (H.G. Wells : The Outline of History. London, 1920)

আলোচ্য গ্রন্থে বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল সাইন্সের Academic গাইডলাইন যেমন দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সুদৃঢ় সম্পর্কের দিকটি প্রমাণের পাশাপাশি স্রষ্টার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিও এসেছে সর্বতোভাবে।

মানব ভ্রূণতত্ত্বের সার্বিক পর্যালোচনা প্রমাণ করে কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ যাতে কোন প্রকার ভুলের লেশ মাত্রও নেই। ভ্রূণতত্ত্বের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বর্তমান বিজ্ঞান যে সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে তা ১৪৫০ বছর আগে আল কুরআনের সূরা মু'মিনুনের ১২-১৪ নং আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা করেছে।

মানবদেহের হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্রসহ ফিংগার প্রিন্ট এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল মানুষকে আল্লাহর সামনে মস্তিষ্ক নত করতে বাধ্য করেছে দেখুন না- মানবদেহ : অপার বিস্ময়ের হাতছানি।

মানবকোষের গঠন প্রকৃতি, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকর্ম, যৌগের ভৌত ধর্ম, ঔষধের প্রস্তুত প্রক্রিয়া সবকিছুর বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ পর্যালোচনা স্রষ্টার নির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রমাণ করে।

বিজ্ঞানের আলোকে বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব; রাকিব আর কায়ছারের আলোচনায় স্পষ্ট করেছে ডারউইনিজমের অসারতা; প্রমাণ করেছে মানুষ বিশ্বস্রষ্টার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফসল আর আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলাই মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলমানদের গৌরবগাথা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সত্য ইতিহাস জানতে যেমন সহায়তা করবে তেমনি আদর্শ হাসপাতাল ও সুচারুভাবে হাসপাতাল পরিচালনার একটি দিকনির্দেশনাও দেবে।

আমরা আশা করি, বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় দক্ষতা প্রমাণের জন্য যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

মানবদেহ: অপার বিস্ময়ের হাতছানি

এক ছিল রাজা, তার রাজ্যে ছিল সুখ আর শান্তির ফল্গুধারা। কিন্তু তার এ সুখ পছন্দ হয়নি শত্রুবাহিনীর। তাই তারা প্রতিনিয়ত আক্রমণ করত রাজ্যের অভ্যন্তরে। অবশেষে রাজ্যের রক্ষাকল্পে পুরো রাজ্যের চারপাশে তৈরি করা হল এক বিশাল দুর্গ। শুধু তাই নয়, দুর্গের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে রাজার অন্দরমহল পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাখা হল প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী, যারা প্রত্যেকেই ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত। এবার আর পেরে উঠতে পারছিলনা শত্রুবাহিনী। দুর্গের পাশে ভিড়লেই তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হত বিষাক্ত তরল যা তাদের মুহূর্তেই কাবু করে ফেলত। এরপরও যদি কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করত তাদের ভাগ্যে জুটত বর্শা আর তলোয়ারের আঘাত। এদিকে রাজা নির্বিঘ্নে দিন কাটায় অন্দরমহলে। এ গল্পের এখানেই সমাপ্তি নয়, কিন্তু যদি বলা হয় এমন একটি গল্প আমরা প্রতিনিয়ত সাথে করে বয়ে বেড়াচ্ছি তবে যে কেউ অবাক হতেই পারে। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকের সাথেই আছে এমন একদল সৈন্যবাহিনী যারা প্রতিনিয়ত আমাদের রক্ষা করেই চলছে। অথচ আমরা টেরও পাচ্ছি না। কী বিশাল যুদ্ধ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে আমাদের শরীরে। সম্ভবত একটি উদাহরণ না দিলে এর মর্মার্থ বোঝা কঠিন হবে। যেমন: আমাদের শ্বসনের সাথে প্রতি মুর্হূতেই হাজার হাজার শত্রুবাহিনী আমাদের আক্রমণ করছে। এই শত্রুবহরে রয়েছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু এদের মধ্যে যারা নাক দিয়ে আমাদের অন্দরমহলে প্রবেশের চেষ্টা চালায়, তারা শুরুতেই এক বিশাল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। নাসারন্ধ্রের মিউকাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত রসের আক্রমণে শত্রুসৈন্যের ৮০-৯০ ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীরা হয়ত বেঁচে থাকে। কিন্তু শ্বাসনালী জুড়ে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চুলের ন্যায় সিলিয়া থাকে তাদের অনুরণনে এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর এর প্রভাবে হাঁচি ও কাশির উদ্রেক হয় এবং হাঁচির সাথে আক্রমণকারী মাইক্রোবগুলো বের হয়ে আসে। যারা এতকিছু অতিক্রম করে আমাদের ফুসফুসে গিয়ে হাজির হয় তাদের জন্য রয়েছে তৃতীয় স্তরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ফুসফুসের অভ্যন্তরে ফ্যাগোসাইটগুলো এই ক্ষতিকারী অনুজীবগুলো গিলে ফেলে এবং নিজেই এদেরকে নিয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে। সত্যিই বিস্ময়কর! প্রতিটি নিঃশ্বাসের আবর্তে কত বিষাক্ত অনুজীব আমাদের আক্রমণ করছে আর মুহূর্তেই কত বিশাল যুদ্ধ শেষে আমরা নিরাপদ হচ্ছি তা আমরা ক্ষণিকের জন্যও টের পাচ্ছি না। এমন হাজারও বিস্ময়ে ভরা আমাদের মানবদেহ।

শ্বসনতন্ত্র বিস্ময়কর রক্ষাকবচ

যদি প্রশ্ন করা হয়, স্পিডস্টার শোয়েব আকতার কিংবা ব্রেটলি কত বেগে বল করে? হয়তো উত্তর পাওয়া যাবে ঘণ্টায় ১৪০ কি.মি. কিংবা ১৫০ কি.মি. তার চাইতেও কিছু বেশি। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয় যে, মানুষের হাঁচির ফলে সৃষ্ট শব্দের বেগ ঘণ্টায় ১৬০ কি.মি.। এত উচ্চগতির কোন প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ, আছে । এর মাধ্যমেই শ্বাসনালীর অপ্রয়োজনীয় বস্তু, বর্জ্য ও অনুজীবগুলো বাইরে বের করে দেয় ফুসফুস। কিন্তু এত শক্তি পেল কোথায় ফুসফুস? কী আছে এতে? মানুষের ফুসফুসের মূল একক অ্যালিভিওলাই তথা বায়ুথলি এদের মধ্যে কাজ করে ফুসফুস। তথ্যমতে, একজন মানুষের ফুসফুসে সর্বমোট ৭০০ মিলিয়ন বা ৭০ কোটিরও বেশি বায়ুথলি আছে। ফুসফুসের সবগুলো বায়ুথলির ক্ষেত্রফল একটি টেনিস কোর্টের সমান হবে। এই বায়ুথলিগুলো প্রতি নিঃশ্বাসে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে অক্সিজেন দিয়ে, আর প্রতি নিঃশ্বাসের আবর্তেই প্রতিরোধ করছে ভয়ঙ্কর আর বিষাক্ত সব অনুজীবদের। একজন গড় আয়ুষ্কালপ্রাপ্ত সুস্থ মানুষ তার জীবদ্দশায় সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটিবার শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় এবং ততসংখ্যকবার-ই আতঙ্কিত করে তোলে অনুজীবদের।
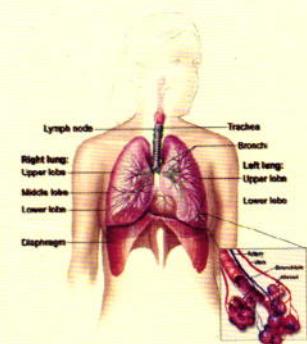
মানুষের ফুসফুস : যাতে আছে সর্বমোট ৭০ কোটি বায়ুথলি

পরিপাকতন্ত্র : বিশাল কারখানার বনসাই
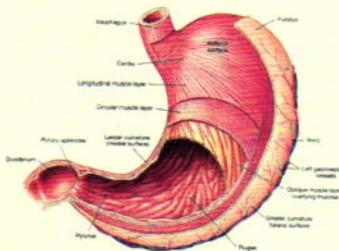
একজন সুস্থ মানুষ গড়ে জীবনে ৫০ হাজার কেজি খাদ্য গ্রহণ করে

একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সিমেন্ট তৈরি করার জন্য কাঁচামাল হিসেবে পাথর আনা হয়। সেই পাথর উচ্চচাপ কিংবা তাপে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে সিমেন্টে পরিণত হয়। আর প্রয়োজনীয় বর্জ্য অথবা ক্ষতিকর বস্তুগুলো ডাম্পিং স্টেশনে ফেলে দেয়া হয়। মানুষের পরিপাকতন্ত্র এমন একটি বিশাল ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিত্ব করে। একজন সুস্থ মানুষ গড়ে জীবনে ৫০ হাজার কেজি খাদ্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ একটি পরিপাকতন্ত্র সারা জীবনে ৫০ হাজার কেজি কাঁচামালকে শক্তিতে রূপান্তর করে এবং তা করে অত্যন্ত সাবধানে ও সুচারুরূপে। খাদ্য গ্রহণের পর প্রথমেই মুখবিবরের লালারসের মাধ্যমে খাদ্য জীবাণুমুক্ত হয় ও নরম হয়ে গলধঃকরণের উপযুক্ত হয়। এরপর তা পাকস্থলীতে যায় এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড এর মাধ্যমে পুনরায় জীবাণুমুক্ত হয়। পাকস্থলীতে বিভিন্ন এনজাইমের মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক চলে ও প্রয়োজনীয় নির্যাস শোষণের মাধ্যমে শরীর ছড়িয়ে পড়ে। আর অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যসমূহ বৃহদান্ত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। এইভাবেই সুচারু নিয়মের মধ্যে চলতে থাকে মানুষের পরিপাকপ্রণালী।

রক্তসংবহনতন্ত্র : সর্বাধুনিক হাইওয়ে সিস্টেম

যদি প্রশ্ন করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও জটিল হাইওয়ে সিস্টেম কোন দেশে রয়েছে। হয়তো উত্তর হবে নিউইয়র্ক সিটি কিংবা টোকিও, যেখানে কয়েক স্তরবিশিষ্ট রাস্তার সাথে রয়েছে সর্বাধুনিক ট্রাফিক সিগনালিং ব্যবস্থা। কিন্তু তার চাইতে উন্নত ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে মানুষের শরীরে, যা মানুষের রক্ত সংবহনব্যবস্থা। মানুষের রক্তসংবহনের জন্য রয়েছে ধমনী (Artery), শিরা (Vein) ও কৈশিক জালিকা (Capillaries)। এদের সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১,০০,০০০ কিলোমিটার। আরো সহজভাবে, যদি সবগুলো রক্তনালিকা একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগানো হয় এবং দুই প্রান্ত স্থাপন করা হয় তবে প্রায় আড়াইবার সমগ্র পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করা যাবে। এবার আসা যাক এদের ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা নিয়ে। একটি রাস্তা তৈরি হয় এর ওপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু একবার রাস্তা তৈরি হলে এর প্রস্থ বা লেনের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো সম্ভব নয়। যার ফলে সর্বাধুনিক ট্রাফিক সিগনালিং ব্যবস্থা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর যানজট একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এমন যানজট কি এক লক্ষ কি.মি. দীর্ঘ মানুষের রক্তনালিতে ঘটে ? না, সুস্থদেহে এমন যানজট অসম্ভব। মানুষের হৃৎপিন্ড, যেটি দৈনিক প্রায় ৬.৫০০ লিটার রক্ত পাম্প করে, রক্ত নালিগুলোতে রক্ত পাঠিয়ে দেয় যা সারা শরীরে পরিভ্রমণ করে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এই রক্ত পরিবহনের সময় রক্তনালিগুলো প্রয়োজন অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। ফলে এখানে যানজটের কোন বালাই নেই। যখন শরীরের বেশি রক্তের প্রয়োজন তখন রক্তনালিগুলো প্রসারিত হয়ে অতিরিক্ত পরিবহনে পথ সৃষ্টি করে দেয়। আবার মানুষ যখন শরীরের কোথাও আঘাত পায় তখন রক্তক্ষরণ রোধ করার জন্য রক্তনালিকাগুলো সংকুচিত হয়ে রক্ত পরিবহন কমিয়ে দেয়। এমন সুনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা সত্যিই বিশ্বাসীদের অবাক করে তোলে।
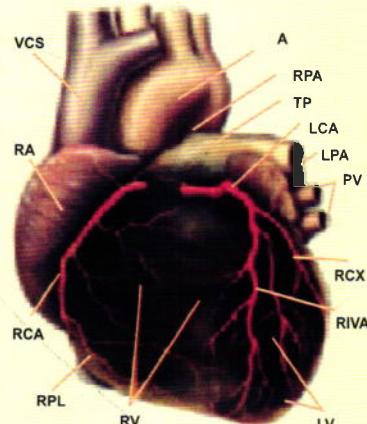
মানুষের হৃদপিণ্ড প্রতিদিন ৬,৫০০ লিটার রক্ত পাম্প করে।

কিড্নি
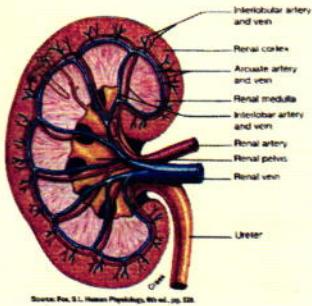
রেচনতন্ত্র : প্রাকৃতিক ছাঁকনি

ওয়াসার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। নদীর দূষিত আর ময়লা পানিকে এক বিশাল প্লান্টের মাধ্যমে পরিস্রুত করে। আমাদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্যই এই বিশাল আয়োজন। এরপরও কি কেউ বলতে পারবে এই পানি পুরোপুরি বিশুদ্ধ? যারা প্রতিনিয়ত এই পানি ব্যবহার করছেন তারা এর যথার্থ সনদ দিতে পারবেন। কিন্তু এমন একটি বিশাল প্লান্টের বনসাই যে আমাদের দেহের ভেতর নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা আমরা ঘুর্ণাক্ষরেও টের পাচ্ছি না। মানুষের শরীরে যে ছাঁকনযন্ত্র তথা কিডনি রয়েছে তা দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১৮০ লিটার তরল পরিস্রুত করা যায়। আমরা প্রতিদিন যে তরল গ্রহণ করি তার মাঝে যেগুলো প্রয়োজনীয় (যথা : মিনারেল, ধাতব আয়ন ও ভিটামিন) সেগুলো শোষণ করে দেহের জৈবিক কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে কিডনি। আর অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলো শরীর থেকে বের করে যথাযথভাবে। দেহের ৮০% বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হয় এই বিশেষ ছাঁকনি তথা কিডনি দিয়ে। বিশেষভাবে তৈরি কিডনিতে পরিশোধনের জন্য রয়েছে মোট ২০ লক্ষ রেনাল টিউবিউল, যার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মাইল।

মস্তিষ্ক : অবিশ্বাস্য এক সৃষ্টি

শাহেদ রাস্তা পার হচ্ছে কারওয়ান বাজার সার্ক ফোয়ারার পাশ দিয়ে। সড়কদ্বীপ অতিক্রম করে যেই রাস্তার মাঝে এলে হঠাৎ সে খেয়াল করল পশ্চিম দিক থেকে তীব্রবেগে একটা দোতলা ভলভো বাস ছুটে আসছে। আর মাত্র কয়েক মিটার দূরেই আছে বাসটি। ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই লাফে পেছনের সড়কদ্বীপের ওপর পড়িমড়ি করে উঠে দাঁড়াল শাহেদ। যেন প্রাণটা ফিরে পেল, পেল নতুন জীবন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে হয়তো সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেল। কিন্তু কেউ কি তাকে চিৎকার করে বলেছিল, "শাহেদ, দ্রুত পেছনে লাফ দাও" হ্যাঁ, বলেছিল। এটা ছিল শাহেদের মস্তিষ্ক। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশনা ও বাস্তবায়নের কাজটি শাহেদের মস্তিষ্কের অবদান। সত্যিই অসাধারণ দক্ষতা। মাত্র ১৩০৫ গ্রামের একটা মস্তিষ্কে গড়ে ১০০ কোটি স্নায়ু আছে যেটি পরিচালনা করে আমাদের পুরো দেহ। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার যে তথ্য জমা রাখে মানুষের মস্তিষ্ক তার চাইতে ১ লক্ষ গুণ বেশি তথ্য ধারণ করতে সক্ষম। আরো অবাক হতে হয় এর কাজের দ্রুততা দেখে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, জটিল সব সমস্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানব মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১ কোটি গাণিতিক ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করতে সক্ষম।

মানব মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ড প্রায় ১ কোটি গাণিতিক ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করতে সক্ষম

ফিংগার প্রিন্ট : মহাগ্রন্থ জানিয়েছে ১৪০০ বছর আগে

অবিশ্বাসীরা যখন জানতে চেয়েছিল মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে কিনা কিংবা তাদের অস্থিসমূহ একত্রিত করা হবে কিনা তখন মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাদের অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? বস্তুত আমি তাদের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম" । (সূরা কিয়ামাহ্ : ৩-৪)

প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বিশেষভাবে আঙুলের অগ্রভাগের কথা বলা হয়েছে কেন ? ১৮৮০ সালে স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন বলেন যে, "দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ কোনদিন কোন সময় একরকম হবে না"। আর এজন্যই পুলিশ, সিআইডি, সিআইএ কিংবা এফবিআই অপরাধী সনাক্ত করার জন্য আঙুলে ছাপ ব্যবহার করে থাকে। সত্যিই এ এক অপার বিস্ময়। বিশ্বের আগত এবং অনাগত কোন মানুষের ফিংগারপ্রিন্ট (আঙুলের ছাপ) আরেকজনের সাথে সদৃশ নয়। প্রত্যেকের একসেট ব্যতিক্রম ও ভিন্ন

FBI সর্বাধুনিক ডিটেকটিং টেকনোলজি হিসেবে ব্যবহার করে ফিংগার প্রিন্ট;
অথচ কুরআনের কাছে এটি একটি প্রাচীন তথ্য

ফিংগার প্রিন্ট রয়েছে। এই ফিংগার প্রিন্ট দিয়ে শুধু পৃথিবীতে মানুষ সনাক্ত করা হবে তাই না, মৃত্যুর পর প্রত্যেকটি মানুষকে আলাদা করার জন্যও এই ফিংগারপ্রিন্ট ব্যবহার করা হবে। এ সম্পর্কে মানুষ স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা পেয়েছে মাত্র এক শতক আগে আর মহা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বের প্রতিটি অনু পরমাণু পরিমাণ কাজ সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত, তিনি এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন ১৪০০ বছর আগে, যখন মানুষ ছিল অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত। এত বিজ্ঞানময় গ্রন্থের ওপরও যারা বিশ্বাস স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন-

"চক্ষু তো অন্ধ নয় বরং তাদের বক্ষের পশ্চাতে যে হৃদয় রয়েছে তা-ই অন্ধ" । (সূরা হাজ্জ : ৪৬)

প্রিফ্রন্টাল এরিয়াকে আমরা কোন পথে পরিচালনা করছি ?

প্রিফ্রন্টাল এরিয়া : হার মেনেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান

পৃথিবীতে যারা মিথ্যাচারী, পাপী ও সীমালংঘনকারী তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে -

"কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয় তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ" । (সূরা আলাক: ১৫-১৬)

এখানে প্রশ্ন জাগে মানুষের মাথায় শুধুমাত্র অগ্রভাগের কেশগুচ্ছের কথা কেন বলা হয়েছে। এই কেশগুচ্ছের কি কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে ? হ্যাঁ, বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে মানুষের সামনের কেশগুচ্ছোর নিচে তথা মাথার অগ্রভাগে মস্তিষ্কের যে অংশ থাকে তা হচ্ছে সেরেব্রামের প্রিফ্রন্টাল এরিয়া। Gray's Anatomy অনুযায়ী "মানুষের পরিকল্পনা, কর্মের সিদ্ধান্ত এবং ভাল অথবা খারাপ কাজের সিদ্ধান্তের উৎস হচ্ছে প্রিফ্রন্টাল এরিয়া" । অর্থাৎ মানুষ খারাপ কাজ করবে না ভাল কাজ করবে তার সিদ্ধান্ত হয় মাথার সম্মুখপ্রান্তের কেশগুচ্ছের নিচে অবস্থিত প্রিফ্রন্টাল এরিয়াতে। যেটি চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে মাত্র এই শতকে। কুরআনে সেই সত্য উন্মোচিত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে। এরপরও যারা সীমালংঘন করে তাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

"তারা কি এই কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না ? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)
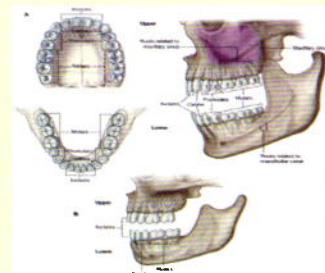
মানুষ মাংসাশী নাকি শাকাশী?

দাঁত চার ধরনের কেন ?

খাদ্যবস্তু মুখে দেয়ার পর সর্বপ্রথম তাকে স্বাগত জানায় দাঁত। যত শক্তিই হোক, দাঁত তার আপ্রাণ চেষ্টা করে একে গলধঃকরণের উপযোগী করার। তাই দাঁতকে হওয়া প্রয়োজন শক্তিশালী আর এজন্যই দাঁতের এনামেল-ই শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। বিভিন্ন বয়সে মানুষের দাঁতের প্রকার ও সংখ্যা বিভিন্ন থাকে। সাধারণত শৈশবে ২০টি, কৈশোরে ২৮টি আর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৩২টি দাঁত থাকে। এই সংখ্যার ওপর নির্ভর করেই শতবছর পরও জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা যায়। আর মানুষের দাঁতের একটি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের ৪ ধরনের দাঁত আছে- ইনসিসর, ক্যানাইন, প্রিমোলার ও মোলার। কেন এত ভিন্নতা? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, যেসব প্রাণী মাংসাশী যথা: বাঘ, সিংহ, এদের দাঁতগুলো অসমান এবং তীক্ষ্ণ। আর যারা শাকাশী তাদের দাঁতগুলো সমান। কিন্তু মানুষের মুখে তীক্ষ্ণ-ভোঁতা, সমান- অসমান সবধরনের দাঁতের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ মাংসাশী ও শাকাশী উভয়ই। এমন পরিকল্পিত সৃষ্টি তো শুধুমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও জমিন এবং এর মাঝে সবকিছু। আল্লাহ বলেছেন-

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটি যদি আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট হতে আসত তবে এতে অনেক অসংগতি থাকত। (সূরা নিসা: ৮২)

ডিএনএ এনসাইক্লোপেডিয়াকেও হার মানায়

মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষের নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় ডিএনএ, যা সংরক্ষণ করে মানুষের সকল তথ্যাদি। একে বলা যায় ডাটা ব্যাংক। ডিএনএ-তে বর্ণমালা সন্নিবেশ ও পুনর্বিন্যাস এর মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে মানব বৈশিষ্ট্যসমূহ। একজন মানুষের উচ্চতা, চোখের বর্ণ, কেশ, ত্বক কোনটি কেমন হবে, এমনকি তার আচরণে কী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে- সে কি বদমেজাজি হবে নাকি শান্ত স্বভাবের হবে, আবেগপ্রবণ হবে নাকি কঠোরতার আধার হবে সে সম্পর্কেও তথ্য থাকে ডিএনএ-তে । বলা হয়ে থাকে কোষের ডিএনএ হচ্ছে একটি ব্লুপ্রিন্ট যেটি বহন করে ২০৬টি অস্থি, ৬০০টি মাংশপেশি, ১০০০০টি শ্রবণেন্দ্রীয়, ২ মিলিয়ন দৃষ্টিস্নায়ু, ১০০ মিলিয়ন স্নায়ুকোষ এবং ১০০ ট্রিলিয়নের চেয়েও বেশি অন্যান্য কোষের তথ্যভাণ্ডার।
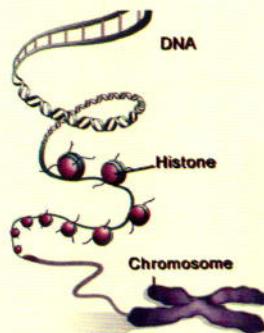
প্রত্যেকটি ডিএনএ বয়ে বেড়াচ্ছে ৫ বিলিয়নের চাইতে বেশিসংখ্যক তথ্য

একটি সাধারণ তুলনা করলেই বোঝা যাবে ডিএনএ-তে কী পরিমাণ তথ্য লুক্কায়িত আছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনসাইক্লোপেডিয়া হচ্ছে ``Encyclopedia Britannica" যেটি ২৩ ভলিউমে সর্বমোট ২৫.০০০ পৃষ্ঠার লিখিত ভাণ্ডার। মানুষের শুধুমাত্র একটি ডিএনএ-তে যে পরিমাণ তথ্য রয়েছে তা যদি কাগজে লেখা হত তবে তা পূর্ণ করত ১ মিলিয়ন পৃষ্ঠা, যা হতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় Encyclopedia-র চাইতে ৪০ গুণ বড়, যেখানে জমা থাকত ৫ বিলিয়নের চাইতে বেশিসংখ্যক তথ্য। পৃথিবীতে আগত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের প্রত্যেকের ১০০ ট্রিলিয়ন কোষের প্রত্যেকটিতে অবস্থিত এত বিশাল ডাটা ব্যাংক প্রমাণ করে এক স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের নিপুণতা ও অসীম ক্ষমতা।

পেইন রিসেপ্টর : সেদিন কি অক্ষত থাকবে ?

আসিফ তার বোনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। রান্না করার সময় গরম পানিতে আসিফের বোনের বাম হাতে কনুই থেকে তালু পর্যন্ত প্রায় পুড়ে গেছে। বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছে। ডাক্তার আসিফের বোনের হাতের বিভিন্ন জায়গায় পিন দিয়ে খোঁচাতে থাকেন। এদিকে আসিফের বোন ব্যথায় চিৎকার করছে। ডাক্তার কিছুক্ষণ পর হেসে উঠলেন। ডাক্তারের হাসি দেখে আসিফের খুব রাগ হল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ডাক্তার আসিফকে ডেকে বললেন, বড় ক্ষতি হয়নি, চামড়ায় এখনও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে অর্থাৎ চামড়ার ওপরের অংশই শুধু পুড়েছে। চামড়ার নিচের পেইন রিসেপটরগুলো অক্ষত রয়েছে। এতক্ষণে আসিফ বুঝল ডাক্তারের হাসির কারণ। হ্যাঁ, মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষ জানতো ব্যথা অনুভূত হয় ব্রেইনের কারণে। ত্বকের নিচের পেইন রিসেপ্টরের কথা জানতো না বড় বড় চিকিৎসক আর

বিজ্ঞানীরাও । কিন্তু যিনি সকল বিজ্ঞানীর বড় বিজ্ঞানী, যিনি সকল চিকিৎসকের বড় চিকিৎসক, তিনি সেই অন্ধকার যুগের মানুষদেরই বলে রেখেছেন এই পেইন রিসেপ্টরের কথা। ত্বকের ব্যথ্যা অনুভূতির কথা।
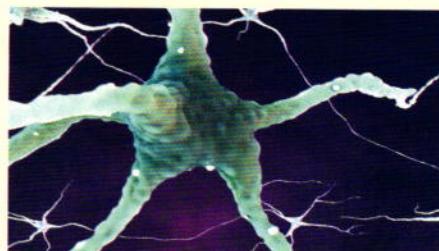
পেইন রিসেপ্টর ; প্রত্যেকবার অগ্নিতে দগ্ধ করে আবার প্রতিস্থাপন করা হবে

কুরআনে এসেছে- "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আমি দোজখের অগ্নিতে দগ্ধ করব। *আর যখনই তাদের চর্ম এই অগ্নিতে দগ্ধ হবে তখন এর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করবে যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে" (সূরা নিসা: ৫৬)*

মানবকোষে হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়েছে ?

প্রত্যেকটা জীবকোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রোটিনের অণু। এই প্রোটিনের অণুর মধ্যে পাঁচটি উপাদান থাকে, যথা: কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর সালফার। এছাড়া একটা অণু তৈরি করতে গেলে হাজার হাজার পরমাণু প্রয়োজন হয়। এখানে একটা অণুর পাঁচটা উপাদান আছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও সালফার। হাজার হাজার পরমাণু নিয়ে একটা প্রোটিন অণু হয়। আর পৃথিবীতে আনুমানিকভাবে ৯২টি স্বাধীন উপাদান আছে। এই ৯২টি উপাদানের মধ্যে ৫টি মিলে একটি অণু গঠন করবে আর এটার মধ্যে হাজার হাজার পরমাণু আছে। এগুলো মিলেই তৈরি হবে একটি প্রোটিনের অণু। এটার সম্ভাবনা হিসেব করেছেন ফ্রান্স এলিয়েন। তার মতে সম্ভাবনা হলো এক বাই দশ টু দি পাওয়ার একশ ষাট। এই এক বাই দশ টু দি পাওয়ার দুই। দশ টু দি পাওয়ার দুই মানে এক শূন্য। দুইটা শূন্য এক বাই একশ। এখানে সম্ভাবনা এক পার্সেন্ট। যদি বলা হয় এক বাই দশ টু দি পাওয়ার তিন। তার মানে এক বাই এক হাজার। সেটা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট । যদি বলা হয় এক বাই দশ টু দি পাওয়ার চার তার মানে এক বাই দশ হাজার। অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট। তাহলে যখন হিসাব করা হবে এক বাই দশ টু দি পাওয়ার একশ ষাট তার মানে পয়েন্ট জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো প্রথমে একশ সাতান্ন শূন্য তারপর এক। অংকের থিয়োরি বলে যদি কোন সংখ্যা এক বাই দশ টু দি পাওয়ার পঞ্চাশ হয় তখন শূন্যই বলা হয়। এর পরে এখানে বলা হয়েছে মাত্র একটা অণু নিয়ে। আর যে উপাদানগুলো দরকার একটা প্রোটিনের অণু তৈরি করতে, সেটার হিসেব করেছেন আরেকজন চার্লস গাই, যে সেক্ষেত্রে লক্ষ কোটি উপাদানের প্রয়োজন হবে। আমাদের গ্যালাক্সির মতো বড় লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি প্রয়োজন হবে শুধু একটা প্রোটিনের অণু তৈরি করেত সময় লাগবে দশ টু দি পাওয়ার দুইশ তেষট্টি বছর। যখন কোনো শিশু জন্মায় তখন তার শরীরে ছয়শ কোটিরও বেশি কোষ থাকে। এখানে একটা প্রোটিনের অণু তৈরির সম্ভাবনা এক বাই দশ টু দি পাওয়ার একশ ষাট। আর এখানে সময় লাগবে দশ টু দি পাওয়ার দুইশ তেষট্টি বছর। তাহলে ছয়শ কোটি কোষ তৈরি সম্ভাবনা কত? হঠাৎ করে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য শূন্য শূন্য কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই স্পষ্টত বলা যায়, এই সৃষ্টি হঠাৎ করে হতে পারে না। অবশ্যই এর পেছনে রয়েছে কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তি।

একটি শিশুর দেহে এমন ছয়শ কোটিরও বেশী কোষ আছে।

শেষ কথা

কয়েক খণ্ড নিজে নিজে মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়নি। এর পেছনে আছে পরিকল্পনা। তেমনি এই পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই আছে বিশ্বাস পরিকল্পনা ও নিপুণ কৌশল।

সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ছাড়া যেমন কোন কাজ হয় না তেমনি একজন দক্ষ পরিকল্পনাকারী ব্যতীত কোন কাজ বাস্তব রূপ পায় না। মানুষ হচ্ছে এই মহাবিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একটি মানুষের দেহের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর অণু পরমাণুতে যে সৃষ্টির কুশলতা আর বিস্ময়ের হাতছানি রয়েছে তা-ই প্রমাণ করে এর পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তাকে যে নামেই ডাকা হোকনা কেন তার দয়ার সীমার বাইরে কেউ নেই। তার দেয়া সূর্যের আলো, তার দেয়া অক্সিজেন সীমালংঘনকারীরাও সমানভাবে ভোগ করেছে। তিনি মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি। মানুষকে দিয়েছেন সকল সৃষ্টির ওপর আধিপত্য, দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি, যাতে তারা দেখে-শুনে, গবেষণা করে সত্যকে খুঁজে নেয় আর পদদলিত করে মিথ্যাকে। পবিত্র কুরআনে সূরা ইনফিতার (৬-৮)-এ আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-

" হে মানুষ! কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যেভাবে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন"

মহাগ্রন্থের মহাসত্যের আলো থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব ?

তথ্যসূত্র

Gray's Anatomy;
Quran & Modern Science- Dr. Zakir Naik
Scientific Indication in The Holy Quran-Islamic Foundation Bangladesh.
www.harunyahya.com
www.irf.net;
www.learner.org;
www.youtube.com;
en.wikipedia.org;
www.fotosearch.com;
www.islamonline.net;

সঙ্কলনে
Ali Hossain Mahid
Student, Dhaka Medical College
e-mail: gunahgar_vai@yahoo.com

স্রষ্টা ও বিস্ময়কর সৃষ্টি

স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্তিত্বহীন প্রমাণ করতে চেষ্টা করা আজকে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে দৃষ্টিতেই দেখি না কেন, আমার দৃষ্টিতে স্রষ্টা প্রকৃতির প্রত্যেক পরতে পরতে বিদ্যমান। মহাবিশ্বে দৃষ্টি দিলে বলা যায়-মহাবিশ্ব এক মহাবিস্ময়! এর শেষ কোথায় তার হদিস মিলবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে এর শেষ দেখার আশায় এত সময়ব্যয় করেছেন যে দিনের আলোটুকু দেখার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত যারা হাল ছেড়ে দিচ্ছেন তারা এই বলে ছেড়ে দিচ্ছেন যে, "অসীম"। মহাবিশ্ব অসীম । কিন্তু অসীমের অর্থটিও বোধগম্য নয়। সর্বসম্মতিক্রমে ধরা হয় "অসীম" হলো তাই যার ওপারে দৃষ্টি পৌঁছাতে পারে না বা যার পরে চিন্তা করা যায় না। বিজ্ঞান এত উন্নত হয়েছে অথচ সমুদ্রের গভীরতম তলদেশ দেখা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কারণ অতল গভীরতায় যেতে চাইলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং পানির চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে যা সহ্য করার মতো কোন যন্ত্রদানব তৈরি করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন : "তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'লার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।" (সূরা মূলক : ৩-৪)

উক্ত আয়াত দুটি মহাবিশ্বের অসীমতা আর দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করেছে। এমন অসীমতা আর দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা যে, আকাশকে ছাদ মনে হয়।

আসলেও মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিস্ময় বাড়া স্বাভাবিক। কেউ যদি একটু এভাবে ভাবে-

মহাবিশ্ব

↓

অসংখ্য ছায়াপথ (সৌরজগৎ যে ছায়াপথে অবস্থিত তাকে Milky Way বলে)

↓

Milky Way - তে আছে
অসংখ্য নীহারিকা (নক্ষত্রপুঞ্জ)

↓

হাজার হাজার নক্ষত্রের আকার সূর্যের চেয়ে কয়েক শত গুণ পর্যন্ত বড়।
সূর্য মধ্যম আকারের নক্ষত্র, যা নীহারিকার তুলনায় বিন্দুর মতো

↓

সৌর জগতের মোটামুটি দশটি গ্রহের মধ্যে মাঝারি অপেক্ষাও ছোট গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী

↓

পৃথিবীর মধ্যে আবার অসংখ্য সৃষ্টি যা থেকে মানুষকে সেরা বলা হয়। এই মানুষ
পৃথিবীর তুলনায় অতি নগণ্য।

↓

মানুষের শরীরের দিকে তাকালে দেখা যায় শরীর মূলত অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত
(C,N,O,H,Na,K,Cl,P ইত্যাদি)

↓

পরমাণুতে আছে মৌলিক কণিকাসমূহ (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন)

↓

ইলেকট্রনসমূহ সদা ঘূর্ণায়মান যা মানবদেহের তাপসৃষ্টিতে, বৈদ্যুতিক সাড়া দিয়ে অনুভূতি তৈরিতে অথবা চলাচলে সাহায্য করে। যেমন হাতে হাত ঘষলে তাপ এবং স্থিরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
এই স্থিরবিদ্যুৎ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে কপালের দুপাশে নার্ভে দিতে পারলে
প্যারাসিটামল ছাড়াই মাথাব্যথা দূর করা যায়। [এখনও পরীক্ষাধীন]

মহাবিশ্বের তুলনায় ইলেকট্রনের অবস্থান কল্পনা করতে গিয়ে চরম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আয়াত : "আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপকে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থিপঞ্জর স্থাপন করেছি তারপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে।" (সূরা মুমেনুন : ১২-১৪)
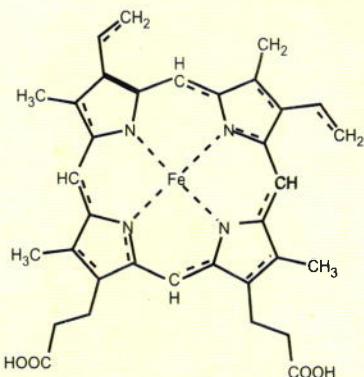
রক্তের কাজের ওপর নির্ভর করছে জীবনপরিক্রমা। রক্তের বৈশিষ্ট্য এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কাজের পরিধি এত ব্যাপক যে এর সমতুল্য কোন তরল বা Semisolid তৈরি সম্ভব হয়নি রক্তের একটি কণিকা লোহিত রক্তকণিকা RBC : Red Blood Cell) এ এমনই বিস্ময়কর সৃষ্টি যে, এটি একটি কোষ কিন্তু কোষের অভ্যন্তরে কোন নিউক্লিয়াস থাকে না। অস্থি মজ্জায় থাকা অবস্থায় সে কোষাভ্যন্তস্থ জিনিস বের করে দেয়। এ অবস্থায় সে বেঁচে থাকে ১২০ দিন। ডারউইনবাদ এর "Survival of the fittest"-এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে লোহিতকণিকার সহজ মৃত্যুবরণ করে নেয়াটা এক চরম আঘাত।

লোহিতকণিকা হিমোগ্লোবিন ধারণ করে আর এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করে। এ অবস্থায় লোহিত কণিকা নমনীয়, সমতল আকার ধারণ করে। যেহেতু এর সেল মেমব্রেন অনেক বড় তাই তা বড় আয়তন ধারণ করতে বা সরু শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে সমস্যায় পড়ে না। অথচ অন্যান্য কোষ ভেঙে যায়।

মহান আল্লাহ সূরা হাদিদে বলেন, " আর আমি নাজিল করেছি লৌহ যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার"। (আয়াত : ২৫)

এর থেকে লৌহের মাধ্যমে বা তার ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধ জয়ের কৌশল বাতলে দেয়া হয়। সেই যুগেও যার লৌহ নির্মিত অস্ত্র যত উন্নত ছিল সে তত শক্তিশালী ছিল-যার উদাহরণ রোম ও পারস্যের যুদ্ধে বোঝা যায়। পারস্য কোণঠাসা প্রায় রোম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় শুধু নৌবাহিনীর দুর্বলতার জন্য। বর্তমানেও যানবাহন থেকে শুরু করে সব ধাতব জিনিস লৌহের নানা অনুপাতের মিশ্রণে তৈরি।

লোহিতকণিকা মূলত দু'টি অংশে গঠিত- "হিম" এবং "গ্লোবিন"- এই "হিম" অংশটির প্রধান উপাদান লৌহ। এর রাসায়নিক স্ট্রাকচারটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। লৌহের জারণ সংখ্যা সর্বদা +২ আর সে কারণেই চারটি পাইরোল এর সাথে যুক্ত থেকেও তা এক অণু অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে। মানবদেহে চারটি ভিন্ন ভিন্ন চেইন-এর হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান (a,B,y,o) যার মধ্যে a,B সাব ইউনিট দু'টি পূর্ণবয়স্ক মানুষে পাওয়া যায়। আর তাই প্রতিটি হিমোগ্লোবিনে চারটি ভিন্ন ভিন্ন আয়রন পরমাণু আছে যা ৪টি o_2 পরিবহন করে থাকে। যদি লৌহের জারণ অবস্থা +৩ হতো তাহলে o_2 পরিবহন অসম্ভব হতো। এখানে o_2 যুক্ত হলে "হিম" এ জারণ হয় ফলে তা অস্থায়ী +৩ জারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে o_2 ছাড়ার সময় আবার +২ রূপ ধারণ করে। এভাবে তার কাজ সম্পাদন করে।

Fe^{2+}.........o_2 বন্ধনটি দুর্বলভাবে যুক্ত থাকে আর তাই অন্য কোনো অণু দ্বারা তা সহজেই প্রতিস্থাপিত হয় যেমন- co,co_2 ইত্যাদি সহজেই Fe^{2+}....co/co_2 গঠন করতে পারে যা বিষক্রিয়া হিসেবে ধরা পড়ে।

এবার আনুবীক্ষণিক দু'টি প্রাণ নিয়ে আলোচনা করা যাক-

ব্যাকটেরিয়া

এর সাথে পরিচয় বর্তমান তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পর্যন্ত হচ্ছে। অন্তত তারা বলতে পারে যে, রোগব্যাধি তৈরি হয় এর মাধ্যমে। ব্যাকটোরিয়া প্রতিরোধ এর কোষের ভেতরেই নানা অংশে বিদ্যমান।
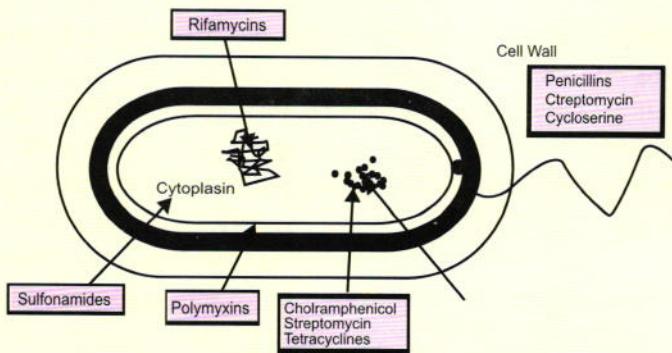
চিত্র : ব্যাকটেরিয়া এবং নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত ঔষুধ

রাইবোজোম t-RNA এর মাধ্যমে m-RNA এর সংযোগ করে যা পরে প্রোটিন হিসেবে দেখা যায়। এই রাইবোজোম মূলত 50S x 3OS উপাংশ নিয়ে গঠিত। নিম্নোক্ত উপায়ে প্রোটিন তৈরি হয়।

এখানে RNA অ্যামিনো অ্যাসাইল RNA রূপে এক অণু অ্যামিনো এসিডকে m-RNA টেমপ্লেটে নিয়ে যায় যা পরে যুক্ত হয়ে প্রোটিন সংশ্লিষ্ট করে। কিন্তু টেট্রাসাইক্লিন এই কাজটি বাধাগ্রস্ত করে। ফলে প্রোটিন সংশ্লেষ বন্ধ হয় যা পরবর্তীতে কোষপ্রাচীর তৈরি করতে পারে না।
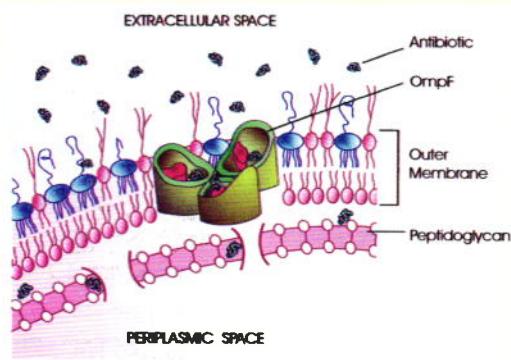
চিত্র : প্রোটিন তৈরিতে টেট্রাসাইক্লিনের বাধা দান

এই রকম পেনিসিলিন কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ করে। কুইনোলোন DNA তৈরিতে বাধা দেয়। এইভাবে ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়।

স্যালফোন্যামাইড এর ক্রিয়া কৌশল

এটি ব্যাক্টেরিয়ার ফলিক এসিড তৈরিতে বাধা দেয় যা কোষ প্রাচীর তৈরি করে। প্রক্রিয়াটি নিরূপ-

-টেরিডিন + PABA (প্যারা আমাইনো বেনজয়িক এসিড)

↓ (✗) ← স্যালফোন্যামাইড

ডাইহাইড্রোপটেরোয়িক এসিড

↓ ← গ্লুটামেট

ডাইহাইড্রো ফলিক এসিড

↓ NADPH → NADP

টেট্রাহাইড্রোফলিক এসিড

যে সব ব্যাক্টেরিয়া নিজে নিজে ফলিক এসিড প্রস্তুত করে শুধু সেগুলোই স্যালফোন্যামাইড কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অপরদিকে মানবদেহে ফলিক এসিড প্রস্তুত হয় না বরং বাইরে থেকে নিতে হয়। তাই তারা আক্রান্ত হয় না। একটু ভাবলে বিস্ময় জাগে যদি মানব শরীর নিজে নিজে ফলিক এসিড প্রস্তুত করত তাহলে কী অবস্থা হতো! যে সব ব্যাক্টেরিয়া নিজে নিজে এসিড প্রস্তুত করে শুধু সেগুলোই সালফোন্যামাইড কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অপরদিকে মানবদেহে ফলিক এসিড প্রস্তুত হয় না বরং বাইরে থেকে নিতে হয়। তাই তারা আক্রান্ত হয় না। একটু ভাবলে বিস্ময় জাগে যদি মানব শরীর নিজে নিজে ফলিক এসিড প্রস্তুত করত তাহলে কী অবস্থা হতো!

ভাইরাস

এবার আসা যাক ভাইরাসের বেলায়- ভাইরাস এক সূত্রক বা দ্বিসূত্রক ডিএনএ বা আরএনএ দিয়ে গঠিত যা আবার প্রোটিন কোটিং দিয়ে আবদ্ধ থাকে। একে ক্যাপসিড বলে। কিছু ভাইরাস লিপোপ্রোটিন এনভেলপ দিয়ে গঠিত।

অধিকাংশ ভাইরাস রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ধারণ করে যা বাহকের দেহে কাজে লাগে। রেপ্লিকেশনের বিভিন্ন অধ্যায়কে কাজে লাগিয়ে এন্টি-ভাইরাল ওষুধ তৈরি করা হয়।

* এভাবে যদি ভাইরাল রেপ্লিকেশন জানা না যেত তবে এদের প্রতিরোধ করা বা প্রতিষেধক তৈরি অসম্ভব হতো।

* অধিকাংশ ভাইরাস তাদের রেপ্লিকেশন খুব দ্রুত করে। অথবা কোন শিল্ড তৈরি করে যা এন্টি-ভাইরালকে বাধা দেয়।
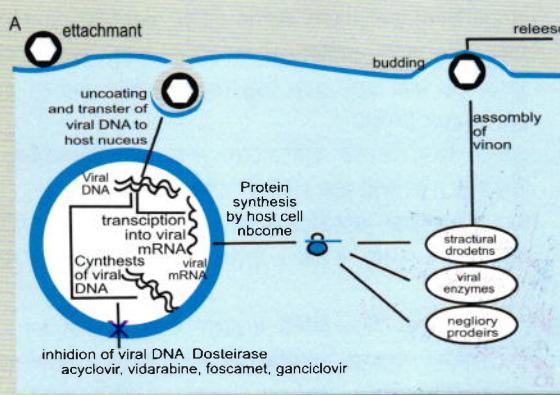
চিত্র : ভাইরাল রেপ্লিকেশন ও তার প্রতিরোধ

* বর্তমানে বার্ড ফ্লু ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার পথে, মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটছে।

* যেহেতু ভাইরাস বাহকের নিউক্লিয়াসে নিজের রেপ্লিকেশন ঘটায় তাই এন্টি ভাইরাল। ঔষধ বাহক কোষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই এন্টি ভাইরাল ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণ আরোগ্য দানের কাজের চেয়েও বেশি।

HIV ভাইরাস যা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক কিন্তু এটি অন্য ভাইরাসের মত ক্রিয়া কৌশল দেখায় না, বরং এই অনুজীব সম্পূর্ণরূপে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। একজন অসুস্থ রোগী যার সামান্য কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তার পক্ষে HIV'র সামনে বাঁচা অসম্ভব। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত The journal of Blimp ve teknik (science and Technology) সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয় যে- 'The more we learn, the less certain we become.'

AIDS মানবজাতির জন্য আসলেই রহস্য। একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হল HIV ভাইরাস শুধু সামান্য কিছু লোকের দেহে প্রবেশ করে। এর প্রধান টার্গেট সাহায্যকারী T-cell যা মানবদেহের প্রধান প্রতিরোধব্যবস্থা। এই বিষয়টি লক্ষণীয়, অসংখ্য প্রকার কোষের মধ্যে শুধু প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিয়োজিত কোষগুলোই আক্রান্ত হয়।

কিছু প্রশ্ন যার উত্তর পাওয়া যায় না

HIV ভাইরাস কিভাবে নির্ভুলভাবে এর টার্গেটকে লক্ষ্যে পরিণত করে? শরীরে প্রবেশ না করেই এরা কিভাবে বুঝতে পারে যে কোনটি T-cell?

কোন প্রতিষেধক পাওয়া যায়নি তা হল- এর কোন DNA থাকে না এবং একে কোন গুণগত জীবন বলে অভিহিত করা যায় না।

এ থেকে বোঝা যায় এত ক্ষুদ্র ভাইরাসের কাছে মানুষ কত অসহায়!

যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, যৌগিক পদার্থের সংশ্লেষ

যৌগের পূর্ব-নির্ধারিত ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি প্রদর্শন করে যা ঐ নির্দিষ্ট যৌগের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম। সামান্য পরমাণুগত পার্থক্য দু'টি যৌগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থে পরিণত করে। উদাহরণ হিসেবে নিচের যৌগ দু'টি দেখি :

$C_{18}H_{24}O_2$ এবং $C_{19}H_{28}O_2$
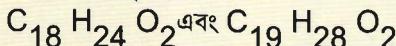
তারা মোটামুটি একই পদার্থ যদিও কয়েকটি পরমাণুর পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে সম্পূর্ণ উল্টো ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এখানে প্রথমটি স্ত্রী-হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং অপরটি টেস্টোস্টেরন যা পুং-হরমোন। অর্থাৎ প্রথমটি স্ত্রী জাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশক আর অপরটি পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক। বেনজিনের দিকে লক্ষ্য করি:

CH_3, H, H, H, H, H

২°- প্রোপাইল বেনজিন
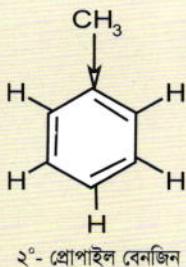
আমরা জানি, এখানে এক ধরনের হাইড্রোজেন বিদ্যমান তথা তাদের ইলেকট্রন ঘনত্ব সমান বলে বেনজিন এক ধর্ম প্রদর্শন করে। অথচ একটি ইলেকট্রন দাতা মূলক যুক্ত করা হলে এতে ভিন্ন ভিন্ন ইলেকট্রন ঘনত্বের হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। যেমন-টলুইন।

এখানে তিন ধরনের হাইড্রোজেন পরমাণুর (ইলেকট্রনিক ইনভায়রনমেন্ট) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। [NMR স্পেক্ট্রোস্কোপি দ্রষ্টব্য]

আর এই ভিন্নতা পরবর্তীতে নির্ণয় করে কোন হাইড্রোজেনটি প্রতিস্থাপিত হবে অন্য কোন মূলক কর্তৃক। যাকে আমরা "অর্থো", "মেটা" ও "প্যারা" প্রতিস্থাপিত বলে থাকি।

কোন কিছু রাসায়নিকভাবে তৈরি করতে গেলে নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসরণ করা হয়। নইলে টার্গেটকৃত যৌগটি পাওয়া যায় না। যেমন- আমরা পড়েছি ফ্রিডেল ক্র্যাফট অ্যালকাইলেশন যেখানে অ্যালকাইলমূলক একটি অ্যারোমেটিক রিং-এ যুক্ত হয় সেখানেও নির্দিষ্ট অণুক্রম রক্ষা করা হয়। প্রোপাইল বেনজিন তৈরিতে আমরা দেখি যে, n- প্রোপাইল বেনজিন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ায় আইসো প্রোপাইল বেনজিন তৈরি হয়।

প্রোপাইল বেনজিন তৈরি হয়।

$$C_6H_6 + CH_3CH_2CH_2Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5CH(CH_3)CH_3$$

(উৎপাদ: CH_3CHCH_3 যুক্ত বেনজিন)
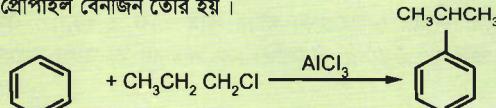
তাই অন্য উপায়ে সমাধানে পৌছা যায় আর তা হলো অ্যাসাইলেশন প্রক্রিয়া।

$$C_6H_6 + CH_3CH_2COCl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5COCH_2CH_3$$

ইথাইল ফিনাইল কিটোন

$$C_6H_5COCH_2CH_3 \xrightarrow{\text{ক্লিমেনসেন বা উলফ কিশনার বিজারণ}} C_6H_5CH_2CH_2CH_3$$

n-প্রোপাইল বেনজিন
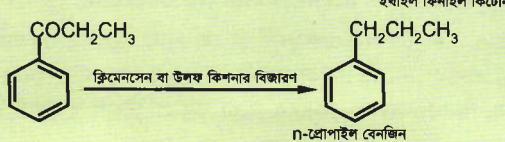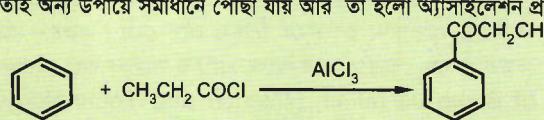
বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় প্রথমে অ্যাসাইলেশন ও পরে বিজারণ ঘটিয়ে টার্গেটকৃত যৌগটি তৈরি হয়। অন্যথায় এই যৌগ প্রায় অসম্ভব।

পেনিসিলিন

প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো ব্যাচের পর ব্যাচ পেনিসিলিন যখন তৈরি করে, তখন প্রকৃতি থেকে এই ওষুধের মূল অংশ তথা ডাই সাইক্লিক অংশটি তৈরি করে নেয়। ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় পেনিসিলিন জি। এই যৌগটি 'লিড' কম্পাউন্ড কারণ এর কাঠামোগত মডিফিকেশন পরবর্তীতে আরও উন্নত যৌগ তৈরি করে।
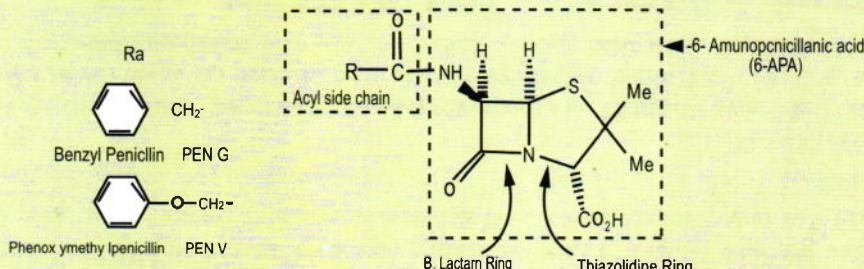
এখানে ৬ - অ্যামেনো পেনিসিল্যানিক এসিড অত্যাবশ্যকীয় অংশ যা প্রাকৃতিক ফারমেন্টেশন দ্বারা তৈরি করতে হয়। পরে অ্যাসাইল গ্রুপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন যৌগ তৈরি হয়। এভাবে প্রথম কার্যকরী ওষুধ পেন-জি তৈরি হয়। ল্যাবরেটরিতে এই অংশটি তৈরি করা হয় না কারণ মাত্র ৫% বিশুদ্ধভাবে তৈরি করা সম্ভব হয় যা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত নগণ্য। এ থেকে মানুষের সীমাবদ্ধতার চিত্র কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়। আর তা হলো মানুষ চাইলেও সংশ্লেষ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন তৈরিতে অক্ষম। তাকে অবশ্যই প্রকৃতির কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

অ্যান্টি-সাইকোটিক ড্রাগ প্রস্তুতি

বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ক্লোরপ্রামাজাইন তৈরি করাও নির্দিষ্ট ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশ। কোন একটি ধাপ বাদ দিয়ে অন্য ধাপে যাওয়া অসম্ভব। বিক্রিয়াটি দেয়া হলোঃ

১ম ধাপ — N-H + S — সাইক্লাইজেশন $I_2/AlCl_3$

২য় ধাপ — অক্সিডেটিভ নাইট্রেশন HNO_3

৩য় ধাপ — NO_2 — বিজারণ Sn/HCl

৪র্থ ধাপ — NH_2 — $NaNO_2/HCl$

৫ম ধাপ — N_2Cl — স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া Cu_2Cl_2/HCl

৬ষ্ঠ ধাপ — Cl

৭ম ধাপ — H_3C, H_3C >$N(CH_2)_3Cl$ — NH_2, $(CH_2)_3N(CH_3)_2$
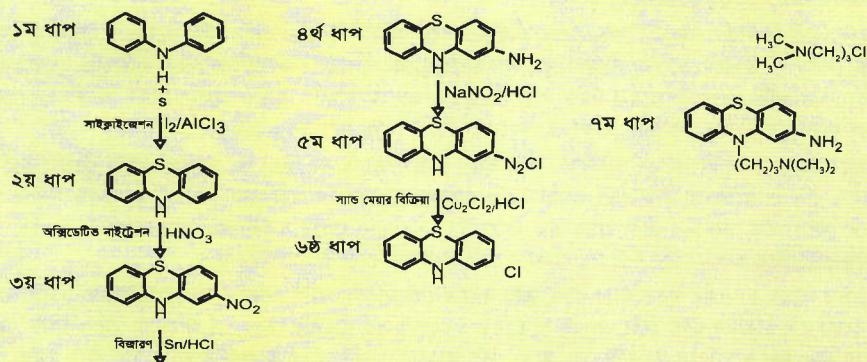
একটি ক্লোরিন পরমাণু প্রবেশ করতে অনেক কসরত করতে হয়। এখানে ৬ষ্ঠ ধাপে ক্লোরিন পরমাণুর প্রবেশ সীমাবদ্ধ।

পানির অলৌকিকত্ব

হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে পানি চেইন তৈরি করে। এই বন্ড বা বন্ধনটির আয়ুষ্কাল প্রায় প্রতি সেকেন্ডের একশত বিলিয়ন ভাগের একভাগ। কিন্তু একবার বন্ধন ভাঙার সাথে সাথেই আবার তা তৈরি হয়। এই হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণেই পানি তাপমাত্রার পার্থক্যে এই রকম থাকে এবং এই তাপশক্তি জীবনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ মানবদেহে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৩৬°C. এবং সর্বোচ্চ ৪২° C.

এই ৬°C তাপমাত্রার পার্থক্য পানিতে তেমন প্রভাব ফেলে না। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে তাই ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যৌগ এই পানি। আর তা হল পানি তরল অবস্থায় অধিক সান্দ্রতা সম্পন্ন এর কঠিন অবস্থার তুলনায়। অথচ অন্যান্য পদার্থ উল্টো ধর্ম প্রদর্শন করে। এ জন্যই বরফ পানির চেয়ে হালকা। যদি কোন ধাতব পদার্থ এর তরলে ছুড়ে ফেলা হয় ধাতব খণ্ডটি ডুবে যায় অথচ পানির বেলায় তা উল্টো। যখন পানি খুব ঠাণ্ডা হয় তখন কোন পুকুর, নদী বা সাগরের পৃষ্ঠে বরফ জমে। পানি ৪°C তাপমাত্রায় সব থেকে ভারী আর তাই এই তাপমাত্রায় পৌছলে তা ডুবে যায়। আর এ কারণেই অত্যধিক ঠাণ্ডায় উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই পানি জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এই পৃথিবীতে। মহান আল্লাহ বলেন-

"তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যাতে তোমরা পশু চারণ কর। এ পানি দ্বারাই তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা না'হল : ১০-১১)

শেষ কথা

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো তা সবই পর্যবেক্ষণের ফলাফল। প্রতিটি বিষয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি বিষয় আরও গবেষণার দাবি রাখে। এ অংশটি পাঠকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়ার জন্য রাখা হচ্ছে। শুধু এতটুকু বলছি যে, সবকিছুই প্রকৃতিতে পূর্ব হতে বিদ্যমান ছিল। কোন কিছুরই নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়নি বা কেউ নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরিতে সক্ষম হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।" যার প্রমাণ সামান্য ইলেকট্রনের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। কোন পরমাণুতেই ইলেকট্রন একাকী থাকতে পারে না। সে কারণেই এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট হাইড্রোজেন দ্বিপরমাণুক। তেমনি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।" (সূরা আর রাহমান : ১৯-২০)

এখানে স্বাদু পানির স্রোত ও লোনা পানির স্রোতকে বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রে নাবিকগণ এটা সুস্পষ্ট বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে খাবার পানি তুলে নেন। এই সুস্পষ্ট পার্থক্য এই কারণে যে, স্বাদু পানির ঘনত্ব লোনা পানির চেয়ে অনেকগুণ কম। আর তাই তারা সহজে মিশে না। নিজেই একটি ছোট পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কোন সেমি সলিড বস্তু নিয়ে একটি ট্রেতে ঢেলে দিয়ে এতে দ্রুতবেগে পানি প্রবাহিত করলে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।" এখানে আল্লাহ তায়ালা খুব সূক্ষ্মভাবে মায়ের পেটে শিশুর বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন যা বর্তমান ডাক্তারি পেশাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে।" (সুরা যিলযাল : ১-২)

এখানে কিয়ামতের দিকে মূল দৃষ্টিপাত করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য তা চমকপ্রদ তথ্য দেয়। আর তা হলো- যদি ঐ কম্পনের কাছাকাছি কম্পন তৈরি সম্ভবপর হয় তবে পৃথিবী তার বোঝা তথা খনিজ সম্পদ বের করে দেবে- যে সম্পদের জন্য আজ এত মারামারি, হানাহানি চলছে। বর্তমানে কৃত্রিমভাবে ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কম্পন তৈরি করে সম্ভাব্য স্থানে তেল/ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এতসব দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও যারা বলে, স্রষ্টা বলতে কোনো সত্তা নেই, প্রকৃতি আপনার নিজের নিয়ন্তা তখন মানুষের একগুঁয়েমির জন্য হাসি আসাই স্বাভাবিক। কারণ, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। অথচ দিনের বেলা কত ক্ষুদ্র স্থান দিয়ে তা পরিভ্রমণ করে! সেই তুলনায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কতটুকু স্থান দখল করে, আর তার ক্যামেরাই বা কত শক্তিশালী যে কেউ বলে ফেলে পৃথিবীর সব দেখে ফেলা হয়েছে?

এখন প্রকৃতির ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ধারণামতে পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে প্রকৃতি গঠিত সেগুলো হল- বায়ু, আগুন, পানি, মাটি, এবং আলো। এর নির্দিষ্ট মিশ্রণে কখনও জীব আবার কখনও জড় বস্তু তৈরি হয়। যেমন- মানুষ, গাছগাছালি, পশু-পাখি ইত্যাদি জীব আর ঘড়বাড়ি, যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি জড় পদার্থ। আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃতি নিজেই নিজেই নিয়ন্তা- তখন এতটুকু বলা উচিত প্রকৃতি মানে কোন সজীব সত্তা। আর এই সজীব সত্তাই মানুষকে ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি দিয়ে অসহায় করে ফেলে। কিন্তু যখন এই

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদান দিয়েই ঘরবাড়ি, দালানকোঠা নির্মিত হয় তখন তারা আর সজীব থাকছে না। আর তখন তারা মানুষকে অসহায় করতেও সক্ষম হয় না। [যদিও বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য এ সবই দায়ী]

তাহলে দেখা যাচ্ছে একই প্রকৃতি একবার সজীব আর একবার নির্জীব। তাহলে প্রশ্ন ওঠে- যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে সে কী করে মারা যায়?

এ থেকে কি এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে যে, এমন কোন সত্তা অবশ্যই আছেন যিনি প্রকৃতিকে কখনও সজীব আবার কখনও নির্জীব করতে পারেন?

পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করবো:

"কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে।" (সূরা হাজ্জ-৩)

আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোন জ্ঞান, পথ নির্দেশনা ও আলো বিতরণকারী কিতাব ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়। এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো।" (সূরা হাজ্জ-৮)

প্রকৃতি ও স্রষ্টার মধ্যে যে কৃত্রিম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা আশা করা যায় শেষ হবে। সবাইকে নতুন ভাবে বোঝার জন্য আরও উদ্যমী হয়ে গবেষণা করতে আহবান জানাচ্ছি নতুবা আমরা উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

কিছু বিষয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ

১. Fe^{3+} নয় বরং Fe^{2+} দিয়ে "হিম" তৈরি হয়।
২. এন্টি ভাইরাল ঔষধ অত্যধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখায়। উপযুক্ত কোন ঔষধ পাওয়া কতটুকু সম্ভব?
৩. HIV- কেন প্রতিরোধ করা যায় না বা এর প্রতিষেধক তৈরি সম্ভব নয় কেন?
৪. স্বাদু পানি ও লোনা পানি আলাদাভাবে সাগরে পাওয়া যায়।
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি বর্তমানে কিভাবে করা সম্ভব?

গ্রন্থ নির্দেশিকা

1) Goodman & Gilman's
The Pharmaceutical Basis of Therapeutics (11th Edition)
2) An introduction to Medicinal Chemistry
Graham L. Patrick. (2nd edition)
3. A Text Book of Organic Chemistry.
B.S Bahl
Arun Bahl.
4) Text book of Medical Physiology-Guyton (8th Edition)
5) Introduction to spectroscopy. (3rd Edition)
6) Foye's Principles of Medicinal Chemistry (New Edition)
7) Miracles in Atoms (Harun Yahya)

লেখক

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
ফার্মাসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

E-mail : knmnnasir@gmail.com
mdnasir.udd@gmail.com

Human Embryology
মানব ভ্রূণতত্ত্ব

কিভাবে এলো এই পরিপূর্ণ মানব শিশু?

পবিত্র কুরআনের আলোকে ভ্রূণতত্ত্বের বিবরণ মূল্যায়ন করার পূর্বে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের কি ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান তা ভেবে দেখা দরকার। উল্লেখ্য যে, এখন থেকে ১৪০০ বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর আল্লাহ তায়ালা যে কুরআন নাজিল করেন এবং তাতে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা আগের ও আজকের মানুষের চিন্তাতীত।

এ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২ বি. সি.) ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাহলো মানবসন্তান ও ভ্রূণের বিভিন্ন দিক। তার সময় ভ্রূণের ওপর দু'টি তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল যেমন :

১. পুরুষের শুক্রাণু অথবা মেয়েলোকের নিঃসৃত রস যার মধ্যে এই সামান্য জীব (কিট) থাকে তা জরায়ুর মধ্যে বেড়ে ওঠে।

২. ঋতুস্রাব থেকে প্রকৃত গঠন ও সৃষ্টি।

এ্যারিস্টটল দ্বিতীয় থিওরির পক্ষ নিয়েছেন। প্রজননে পুরুষ শুক্রাণুর অংশগ্রহণ ক্যাটালিস্ট রোলে খুব সীমিত কারণ এর মধ্যে মাসিক ঋতুর রক্ত জমাটবদ্ধতা আসে। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেন যে, এটা ঘন দুগ্ধ হতে পনির করার সমতুল্য।

ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ

এ্যারিস্টটলের থিওরিকের বহু শতাব্দী ধরে অনেকেই চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায়নি। তবে ১৬৬৮ সালে রেডি এটাকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন এবং ১৮৬৪ সালে প্যাসটের মতবাদ দেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা ধারাবাহিক বিষয়।

১৪ শতাব্দীর ইবন হাজার আল আসকালানি বলেন যে, অনেক এনাটোমিস্ট মনে করেন যে, সন্তান তৈরিতে পুরুষ শুক্রাণু কোন ভূমিকা রাখে না। তবে তারা মনে করেন যে, মাসিক ঋতুস্রাবের ঘনত্ব থেকে মানব সৃষ্টি হয়। এসব কথা হযরত (স.) এর হাদিস এর প্রতিবাদ করে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষ শুক্রাণু প্রকৃতপক্ষে সমভাগে স্ত্রী ডিম্বাণুর মতো ভ্রূণ তৈরি ও সন্তান জন্ম দিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইবন আল কাইয়ুম ঐ একই মত প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত গ্যালেন (দ্বিতীয় শতাব্দী এডি) প্রথম ব্যক্তি যিনি ভ্রূণতত্ত্বের ওপর পুস্তক লিখে গেছেন। তার পুস্তকের নাম ছিলো ON THE FORMATION OF THE FOETUS দি ডেভেলপিং হিউম্যান' নামক পুস্তকের লেখক কিথমুর তৃতীয় সংস্করণে কয়েকটি আশ্চর্যজনক তথ্য প্রকাশ করেছেন যা কুরআনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
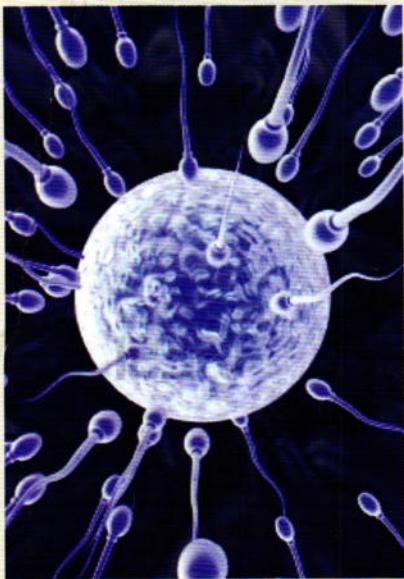
শুক্রাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ডিম্বাণু

১৮ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকলের বিশ্বাস ছিল যে, ডিম্বকোষের মধ্যে ছোট আকৃতিতে মানব থাকতো এবং পরে সময়ের তালে মানুষ হিসেবে মাতৃগর্ভ হতে বের হয়ে আসতো। আবার কেউ কেউ ভাবতো যে, স্ত্রী-পুরুষের ডিম্বাণু ও শক্রাণুর মিলন ঘটলে এবং তা গর্ভাশয়ে পতিত হলে ধীরে ধীরে এক সময় মানব আকৃতি ধারণ করে মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে আসে।

ওলফ (১৭৫৯-৬৯) প্রি-ফরমেশন থিওরিকে অস্বীকার করে বলেন, ডিম্বাণুর মধ্যে গ্লোবিউলস ভ্রূণ তৈরি করে এবং ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ অতিবাহিত হয়ে ঐ আকৃতিবিহীন বস্তুটি জটিল মানবীয় সত্তায় রূপ নেয়। এই ফিনোমেনাকে এপিজেনিসিস বলে।

অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ওলফ এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯০০ সালে প্রিফরমেশন থিওরিকে অস্বীকার করেন এবং একটা উর্বর ডিম্বাণু হতে স্ত্রীর সেল পৃথক করে একটা সম্পূর্ণ এমব্রিওয়ের মধ্যে বাড়তে দেন।

১৮১৭ সালে প্যান্ডার (Pander) মানব এমব্রিওতে তিনটি প্রাইমারি জার্ম লেয়ার দেখান। ১৮২৯-৩৭ সালে ভনবায়ের সকল প্রাণীর জন্য তার মতামতকে আরো উন্মুক্ত করে দিয়ে মানব ডিম্বাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তাই ভনবায়েরকে মডার্ন এমব্রিওলজির পিতা বলা হয়।

প্রিভোস্ট এবং ডুমাস ১৮২৪ সালে ভ্রূণ তৈরিতে ডিম্বাণুর বিভক্তির কথা প্রথমে বলেন। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত কেউ এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারেনি তবে ১৮৫৯ সালে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দু'টি পৃথক সত্তা ও সেল। ১৮৭৫ সালে হার্টউইগ কেবল ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলনে সন্তান উৎপাদন হয় তা বৈজ্ঞানিক ধারা বিবর্তন বলে স্বীকার করেন।

১৮৮৩ সালে ভন বেনডেন প্রমাণ করেন যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সেলস ভ্রূণ গঠনে সমপরিমাণ ক্রোমোসমস জোগান দিয়ে থাকে।

তবে ৫৭০-৬৩২ সাল নাগাত পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর হাদিস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে : ১. মানব ভ্রূণ তৈরিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. মানব ভ্রূণ কোন তৈরিকৃত বস্তু নয় বরং এটা ক্রমে ক্রমে স্তরের পর স্তর গঠিত হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।" (সূরা আদ দাহর : ২)

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, "ওহে ইহুদি, মানব সৃষ্টি হয়েছে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত বীর্য ও নিঃসৃত রস হতে।" (মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল)

পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ আছে :

..."তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছো না অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।" (সূরা আন নূহ : ১৩-১৪)

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। অতঃপর আমি তাদেরকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে'। অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান।" (সূরা মু'মিনুন ; ১২-১৪)

..... "হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অনুধাবন করো, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে তার পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত খণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভস্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।" (সূরা আল হজ : ৫)

স্তরগুলো হলোঃ

১. নুতফাত- একবিন্দু রস
২. আলাকাহ-জরায়ুতে ঝুলন্ত একটা বস্তু
৩. মুদগা-এক খণ্ড চর্বিত গোশত যা সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে।
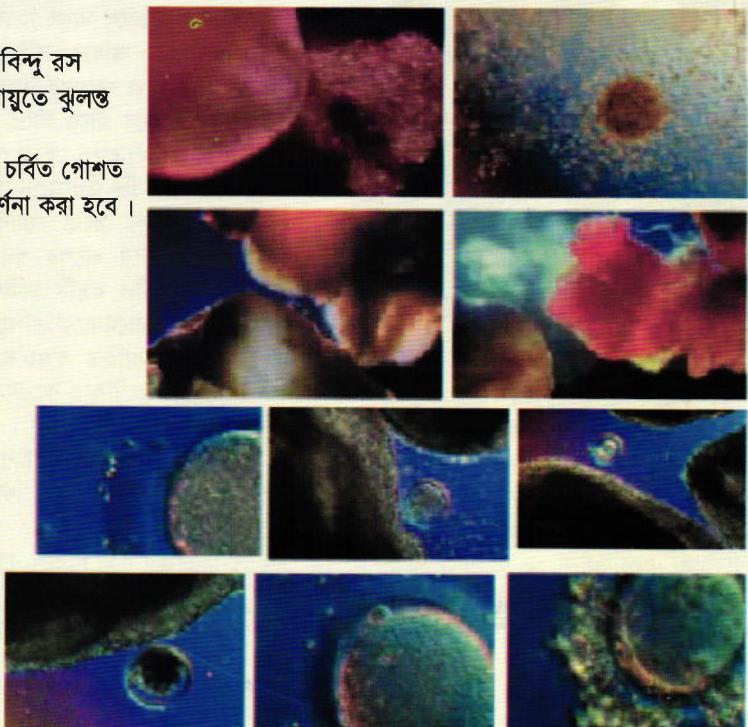
ডিম্বাণু পরিভ্রমণ

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যেভাবে ভ্রূণের উৎপত্তি, মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তার অবস্থান এবং মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা হয়েছে তা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের পক্ষে বর্তমান শতাব্দী ব্যতীত অন্য কোন সময় জানা সম্ভব হয়নি। হয়তো পবিত্র কুরআন ও হাদিসের গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানীরা সঠিক তথ্য জানতে পেরেছেন যা ১৪০০ শত বছর পূর্বে কুরআন ও হাদিসের বর্ণিত হয়েছে। এখন মানুষ তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথমত ওলফ (১৭৫৯-৬৯) মানব সৃষ্টির ভ্রূণের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বলেন কিন্তু তা কেবল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

আল কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রূণের রূপান্তর :

নুতফাহ/আমসাজ ⟶ আলাক ⟶ মুদগাহ

আনসা ⟵ লাহম ⟵ ইযামা

আল কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রূণের রূপান্তর এর সাথে Embryology-এর সম্পর্ক

Embryology- শব্দ	কুরআনে পরিভাষা
Zygote- ⟶	নুতফা আমসাজ
Embryo- ⟶	আলাক্
Somites- ⟶	মুদগাহ্
Ossification- ⟶	ইযামা
Muscle formation ⟶	লাহ্মা
Fetal period- ⟶	আন্সা

ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে আজ বর্তমান বিশ্বে কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কুরআন শরীফে ব্যবহৃত বর্ণনামূলক শব্দগুলোর যথার্থতা পরে বর্ণনা করা হবে। এখানে আমরা যে জিনিসের জোর দিতে চাই তাহলো বিংশ শতাব্দীর আগেও শব্দগুলো সম্পর্কে কারো কোন ধারণাই ছিল না।

নুতফাহ

নুতফার শাব্দিক অর্থ হলো এক ফোঁটা তরল পদার্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে একে তিনভাবে বর্ণনা করেছে।

১. পুরুষ নুতফাহ (পুরুষ গ্যামেট)
২. স্ত্রী নুতফাহ (স্ত্রী গ্যামেট)
৩. স্ত্রী পুরুষের মিশ্রিত নুতফাহ (মিশ্রিত পদার্থ) বা 'নুতফাতুল আমসাক'।

এখানে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে নুতফাহ-এর বিভিন্ন স্তর ও অর্থ ব্যাখ্যা, সেই সাথে কুরআন ও হাদিসের শুক্রাণু বা তরল পদার্থকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। কুরআনের বার জায়গায় নুতফাহ শব্দটি বলা হয়েছে এবং তিন জায়গায় মানি "শুক্রাণু" শব্দটি বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষ থেকে নিঃসৃত বা পুরুষ তরল পদার্থ সম্বন্ধে কুরআনের অনেক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে 'মাআ মাহিন' এবং দাফাক' বলে অভিহিত করেছে।

জাইগোটের বিভাজন

জরাইয়ুতে জাইগোটের অবস্থান

পুরুষ নুতফাত

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নহেন?" (সূরা কিয়ামাহ : ৩৬-৪০)

"আর এই যে তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়, আর এই সে পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তারই।" (সূরা আন নাজম : ৪৫-৪৭)

... "আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না। তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে। তা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি।" (সূরা ওয়াকে'আ : ৫৭-৫৯)

কোষ বিভাজনের পর দেখতে গোশত্ পিণ্ডের মত অংশ

এই তিনটি সূরায় অনেক ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি তার ওপর চিন্তা করা যায় এবং মনোনিবেশ করা হয় তবে মানুষের অজানা ও সত্য তথ্যের খবর পাওয়া যাবে।

১. প্রসূত সন্তানের সেক্স পুরুষ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত আয়াতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক বিন্দু স্খলিত শুক্রবিন্দু বা তরল পদার্থ হতে স্ত্রীর এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে এটা সকলেই জানে যে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে পুরুষ হতে যে স্খলিত তরল পদার্থ বের হয় তাহলো শুক্রাণু। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় স্ত্রী হতে এধরনের কোন শুক্র বের হয় না।

আমরা জানি যে, সদ্য প্রসূত সন্তানের সেক্স শুক্রাণু দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে যা গর্ভাশয়ে উর্বরতা প্রাপ্ত হয়ে পরে ধীরে ধীরে মানবীয় আকার ধারণ করে। যদি শুক্রাণু বীজ X ক্রোমোসমস বহন করে এবং গর্ভাশয় উর্বর হয় তবে সে সকল সময় X ক্রোমোসমস ধারণ করবে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম দেবে আর যে Y ক্রোমোসমস বীজ ধারণ করবে সে ছেলে সন্তান জন্ম দেবে।

পবিত্র কুরআনে X ও Y ক্রোমোসমের এ ঘটনা বা তথ্য ১৪০০ শত বছর আগে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যা কেউ জানতো না। আজ কুরআনের বদৌলতে সকল বিজ্ঞানীই সেই সত্য তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

২. দ্বিতীয় জরুরি পয়েন্ট হলো যে, পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, শুক্রাণুর একট ক্ষুদ্র অংশ ভ্রূণ তৈরি করতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এবং সন্তান উৎপাদনক্ষম হয়।

আল্লাহতায়ালা স্ত্রী ও পুরুষকে এক শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন যা স্খলিত হয়েছিল।" (সূরা আন নাজম : ৪৪-৪৫)

আমরা জানি যে, শুক্রাণু কেবল মাত্র স্খলিত মোট শুক্রাণুর ৫% হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক স্খলিত তরল পদার্থে গড়পড়তায় ২০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন স্পারমাটোজোয়া (Spermatozoa) ধারণ করে থাকে । কিন্তু এর ভেতর থেকে কেবলমাত্র একটা বীজ গর্ভাশয়ে গিয়ে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিশে গর্ভধারণ করে থাকে এবং সন্তান উৎপাদনক্ষম হয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আবারও উল্লেখ করেন:

"অতঃপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু হতে উৎপন্ন করে যা নিকৃষ্ট পানির মতই। (সূরা সাজদা : ৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর হাদিসে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত স্খলিত তরল বীর্য হতে মানুষের সৃষ্টি নয় বরং একটা ক্ষুদ্রতম অংশ হতে। (মুসলিম)

এ সকল ঘটনা বর্তমান কাল ছাড়া মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিলো।

স্ত্রী নুতফাহ (Female nutfah)

স্ত্রীর নুতফাহ সম্বন্ধে কুরআনে সঠিকভাবে কোন বর্ণনা নেই। তবে কুরআনে নুতফাতুল আমসাক সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। নুতফাতুল আমসাক হলো স্ত্রী-পুরুষের মিলিত বা মিশ্রিত তরল পদার্থ। এ সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। হযরত আহমদ ইবন হাম্বাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা একজন ইহুদি হজরত মুহাম্মদ (সা)- এর নিকট জিজ্ঞেস করলো যে, " হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন কিসের থেকে মানুষ সষ্টি হয়।"

উত্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, ওহে ইহুদি, স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নুতফাহ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।"
হজরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস (রা) এর সময়কাল থেকে কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মিশ্রিত-নুতফাহতুল আমসাক অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মিশ্রিত নুতফাত।

এটা একটা খুব আশ্চর্যজনক আবিস্কার। বর্তমানে যা আবিষ্কৃত হয়েছে বা যা জানা গেছে তাহলো পুরুষ ও স্ত্রীর সহবাসের ফলে উভয়ের যে নুতফাহ মিশ্রিত হয় সেই মিশ্রিত নুতফাহ থেকে মানুষ অথবা প্রাণীর জাইগোট সৃষ্টি হয়। হার্টউইগ ১৮৭৫ সালে লক্ষ্য করেন যে পুরুষ শুক্রাণু এবং স্ত্রী ডিম্বাণুর মিলনে জাইগোট গঠিত হয়। তার এ আবিষ্কারের আগে অন্যরা কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেননি।

১৮৮৬ সালে ভ্যান বেডেন প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষ এবং স্ত্রীর সমভাবে অংশগ্রহণের ফলে জাইগোট গঠিত হয়।
হার্টউইগ এবং বোভেরির আবিষ্কারে পূর্বে নুতফাহ ও মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। একদল বলেন সম্পূর্ণ ভ্রূণ ওভা থেকে তৈরি হয় আর একদল দাবি করেন যে ভ্রূণ পুরুষ শুক্রাণু থেকে তৈরি হয়।
নুতফাতুল আমসাক "মিশ্রিত নুতফা' যা উভয়- পুরুষ ও স্ত্রীর সহবাসের ফলে ঘটে থাকে। এটা কুরআনের সূরা আদ দাহর এ বর্ণিত আছে।

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।" (সূরা আদ দাহর :২)

হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত তরল পদার্থ যা সমভাবে পুরুষ ও স্ত্রীর নিঃসৃত করে, সেই মিশ্রিত নুতফাহ থেকে পর্যায়ক্রমে মানব সষ্টি হয়। এ ব্যাপারে পূর্বে ভ্রূণ তত্ত্বের ইতিহাসে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে কিভাবে পুরুষ শুক্রাণু ও স্ত্রী ডিম্বাণুর মিলনে জাইগোট তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে সেই স্তর থেকে মানব তৈরি হয়। এটা যদিও পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণার বাহিরে ছিলো কিন্তু বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে মানুষ কুরআনের সেই তথ্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। কুরআনে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা অন্য কোথাও নেই বা কেউ এ তথ্যকে অস্বীকারও করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। এটা বর্তমান বিশ্ব সমাজে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে বিবেচিত।

প্রিফরমেশনাল অথবা এপিজেনেটিক

(EPIGENETIC)

The Role of Genes

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছেঃ "মানুষ ধ্বংস হোক! সে কতো অকৃতজ্ঞ। তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন।" (সূরা আবাসা : ১৭-২০)

পবিত্র কুরআনের মানবীয় ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দু'টো দিকের উল্লেখ আছে। যেমন:

১. এপিজেনেটিক যার মধ্যে নুতফাতুল আমসাক (জাইগোট) আলাকে পরিণত হয়। অর্থাৎ এ বস্তুটা জরায়ুতে আটকিয়ে থাকে। পরে আলাক মুদগাতে পরিণত হয় অর্থাৎ একটা চর্বিত গোশত যাকে সোমাইট স্তর বলা হয়। তারপর সোমাইট পৃথকভাবে হাড় ও
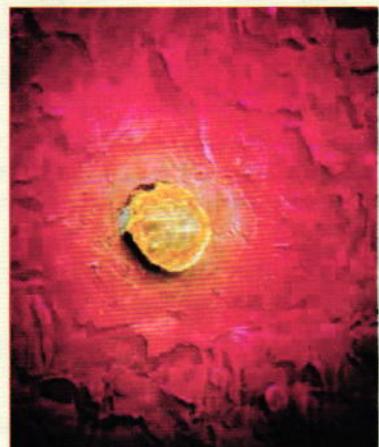
জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থান

মাংসে পরিণত হয় যা পরে গোশত দ্বারা আবৃত হয়। এভাবে মানবীয় ভ্রূণ পরবর্তীতে মানব আকৃতি ধারণ করে। আল্লাহ সকল শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

২. প্রিফরমেশনাল- এ অবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রীর গ্যামেট আগমনোন্মুখ মানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

লেসলি এ্যারে ডেভেলপমেন্ট অব এনাটমিতে বর্ণনা করেছেন:

"এই বিষয়ের ওপর বর্তমান মতামত হলো এই জিনস (Genes) ও তাদের বংশানুক্রমিক প্রভাবিত ভ্রূণের ক্রমবিকাশের ওপর প্রিফরমেশনাল কিন্তু বাস্তবিকভাবে গঠন প্রণালিতে এপিজেনেটিক। কিথমুর হ্যামিলটন, বয়েড এবং মসম্যান, জন ল্যাংগম্যান, ব্রাডলি, প্যাটেন সকল ভ্রূণতত্ত্ববিদই এ কথা স্বীকার করেন।

উল্লেখ থাকে যে, একজন বেদুঈন হজরত মুহাম্মদ (সা) কে- বলেন যে, তিনি ও তার স্ত্রীর কালো রং এর না হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী একটি কালো বালক সন্তান জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এ বালককে তার বলে স্বীকার করতে চান না তখন হযরত (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট আছে। তখন বেদুঈন বলেন, হ্যাঁ আমার উট আছে। তার উটের কী রঙ তা জানতে চাইলে উক্ত বেদুঈন জানান যে, তার উট লাল-হলুদ। পুনরায় হজরত (সা) যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মধ্যে কোন কালো রঙের উট আছে, তখন উক্ত ব্যক্তি বলেন হ্যাঁ। তখন হজরত মুহাম্মদ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কিভাবে লাল-হলুদ রঙের উটের বাচ্চা কালো রঙের হলো। তখন উক্ত বেদুঈন বললেন হয়তো কোন ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তখন হজরত মুহাম্মদ (সা) বললেন যে, তোমার সন্তান নিশ্চয় কালো রং উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত)

অর্গানোজেনেসিস

পবিত্র কুরআন ও সিহাহ সিত্তা হাদিস গ্রন্থে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা বিজ্ঞনীদের চিন্তাধারার থেকে অনেক উন্নত। এর অর্থ দাঁড়ায় সে কুরআনের মধ্যে হজরতের (সা) হাদিসশাস্ত্রে যেভাবে মানব ভ্রূণ গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দেয়া আছে তা বর্তমান শতাব্দীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে যা তারা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কখনো জানতে পারেনি।

ভ্রূণতত্ত্ববিদদের মতে নুতফার অবস্থাতেই পুরুষ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং মানব সন্তানের ক্রমবিকাশ বা বিভিন্ন স্তর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় যা বর্তমান ভ্রূণতত্ত্ববিদগণ কেবল বর্তমানে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদিস ১৪শত বছর পূর্বে যে ঘটনা মানব জানতো না তা প্রকাশ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন :

"আল্লাহ তায়ালা নুতফার বিভিন্ন স্তর গঠনের জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেন। আলাক ও মুদগার বিভিন্ন স্তরে তিনি আল্লাহর কাছে বিনীত আবেদন রাখেন যে, হে আল্লাহ এরপর কী করা হবে? যদি আল্লাহ এর পূর্ণ বিকাশ চান তখন ফেরেশতা বলেন এটা কি বালক না বালিকা, সুখী বা অসুখী, তার জীবিকা এবং বয়োসীমা। সবকিছুই সন্তানের মাতৃ গর্ভাবস্থায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন ৪০-৪২ দিনে ভ্রূণের উর্বরতার সময় একজন ফেরেশতা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং নতুফাকে তার আকৃতি ও গঠন দেয়, শোনা ও দেখার জন্য কান ও চক্ষু সৃষ্টি করে, হাড়, মাংস ও চামড়া তৈরি করে। তারপর আল্লাহর কাছে নিবেদন করেন এটা কি বালক বা বালিকা, তার জীবিকা এবং বয়স কত হবে। আল্লাহ ফেরেশতার উত্তর দেন এবং সেভাবে তিনি সব লিখে নেন। (মুসলিম হতে বর্ণিত)
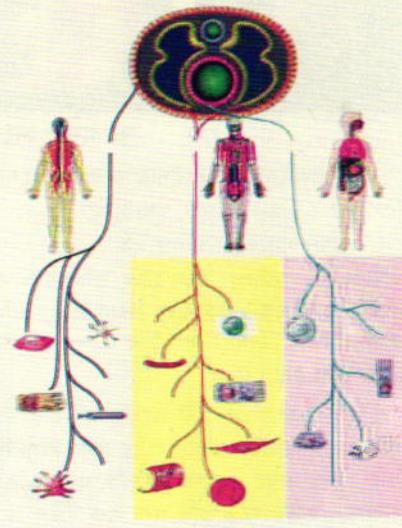
আলাকাহ

আরবি শব্দ আলকার প্রকৃত অর্থ হলো কিছু আঁকিয়ে থাকা বা সংলগ্ন হওয়া। একে জলৌকাও বলা হয়। এটা জরায়ুর মধ্যে আটকিয়ে থাকা অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লিচ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই বস্তুকে মেডিক্যাল সাইন্সে জমাট রক্তও বলা হয়।

এখানে দেখা যায় যে, একটি শব্দের একাধিক অর্থ আছে। আরবি একটি শব্দের প্রায় অর্ধ ডজন অর্থ থাকে। আর এ জন্যই কুরআন শরীফকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন। বিভিন্ন তাফসিরকারক একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন।
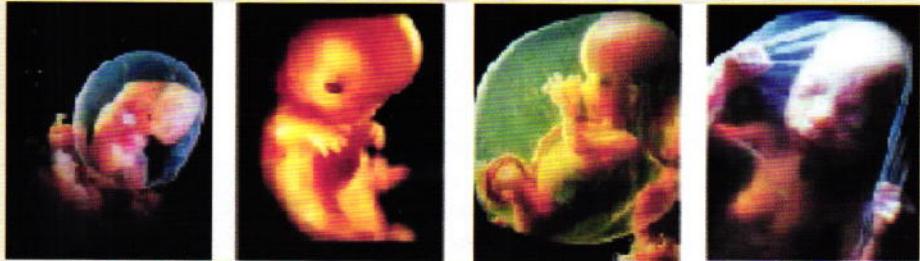
আলাকাহ থেকে পরিপূর্ণ মানবশিশু

পবিত্র কুরআনে পাঁচ জায়গায় আলাকা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। সেগুলো সূরা হজের ৫ আয়াত, সূরা কিয়ামার ৩৬-৪০ আয়াত, সূরা মুমিনের ৬৭ আয়াত, সুরা আলাকার ১-৩ আয়াত, সূরা মুমিনুনের ১২-১৪

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাক হতে, তারপর পূর্ণ কৃতি, অথবা অপূর্ণ কৃতির গোস্তপিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও"। (সূরা আল হজ : ৫)

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।" (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর আলাক হতে, তারপর তোমাদের বের করেন শিশু রূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে তারপর হও বৃদ্ধ (সূরা মু'মিন : ৬৭)

"সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নয়?" (সূরা কিয়ামা : ৩৭-৪০)

"পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে, পাঠ করো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।" (সূরা আলাক : ১-৩)

শুক্রাণু দ্বারা গর্ভাশয় উর্বরতা লাভ করলে উর্বর ডিম্বাণু পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র সেলে বিভক্ত হয়ে পড়ে যাকে ব্লাসটোমেয়ারস্ (Blastomeres) বলা হয়। তৃতীয় দিনে মালবেরীতে ১২-১৬ টা সেল গঠিত হয় সে জন্য তাকে মরুলা বলে। মরুলা বাড়তে থাকে। মরুলার মধ্যে তরল পদার্থ দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় যা একটা বল আকৃতি ধারণ করে। বল আকৃতি বস্তুটিকে ব্লাসটুলা এবং যে ক্যাভেটি ফ্লুইড দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় তাকে ব্লাসটোসিল (Blastocele) বলা হয়। ব্লাসটুলা আয়তনে কেবল মাত্র ০.১ মিঃ মিঃ ডায়ামিটার হয়।

যেহেতু উর্বরতা সাধারণত ইউটেরাইন টিউবের তৃতীয় লেয়ারের বাহিরে ঘটে, সেহেতু নিশ্চয় কোন না কোনভাবে উর্বর ডিম্বাণু ইউটেরাসে চলে যায়। মরুলা ও ব্লাসটুলার কোন পরিচালন ক্ষমতা নেই। এটা

একটা নিষ্ক্রিয়াকৃতির বলের মতো যা পরিচ্ছন্নভাবে ইউটেরাইন টিউব এর সিলিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। এ জন্য সিলিয়া যখন স্ফীতি দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় এটা তখন বন্ধ্যত্বে পরিণত হয়।

আলাকাহ থেকে মুদগাহ্

ব্লাসটুলা ৪-৫ দিনের মধ্যে ইউটেরাসে পৌঁছে এবং ইউটেরাইন ওয়ালে আটকানো এবং রূপিত হবার দু'দিন পূর্বে ইউটেরাইনের নিঃসৃত রসে মুক্তভাবে থাকে। সাধারণত পোসটেরিয়র ওয়ালের উপরের তৃতীয় স্তর মিশ্রিত পদার্থ রোপণের জন্য ভাল স্থান।

তবে এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে ইবনে হাজার আল আসকালীন তার "ফাতাহ আলবেরি সারাহ সাহিব আল বোখারী" পুস্তকে বর্ণিত আছে যে "সিমেন যখন গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে তখন এটা গর্ভাশয়ের প্রতিপাদন ব্যতীত তথায় ছয় দিন অবস্থান করে।"

তিনি আবার ইবনে আল কাইয়ুম থেকে বর্ণনা করেন যে, সিমেন যখন গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, এটা একটা বলের আকৃতিতে গঠিত হয় এবং এটা গর্ভাশয় ওয়ালের সংগে আটকিয়ে যাবার ছয় দিন পূর্বে তথায় ছয় দিন অবস্থান করে। তবে ব্লাসটুলার মধ্যে তরল পদার্থ যখন বাড়তে থাকে তখন এটা সেলকে দু'টো স্তরের মধ্যে পৃথক করে দেয়। বাহির স্তর পুষ্টি সেল দ্বারা তৈরি সে জন্য এটাকে ট্রোফোব্লাসটস (Trophoblasts) বলে এবং ভেতরের সেল ম্যাস পরে এমব্রিওতে জন্মে থাকে।

মুদগা

আরবিতে মুদগা শব্দের অর্থ চর্বিত গোশত পিণ্ড অর্থাৎ যে গোশতকে দাঁত দ্বারা চিবানো হয়েছে। জনাব এ. ইউসুফ আলী কুরআনের ইংরেজি তরজমায় চর্বিত গোশতকে এক টুকরা গোশত বলেছেন যা মুদগার পরিপূরক শব্দ নয়। মুহাম্মদ আসাদ এবং মরিস বুকাইলি তাদের তরজমায় এক টুকরা চর্বিত গোশত পিণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। মুদগা শব্দটি পবিত্র কুরআনে সূরা হজের পঞ্চম আয়াত এবং সূরা মুমিনুনের ১৩-১৪ আয়াতে দু'বার বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলের (সা) হাদিসের মুদগার কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। "হে
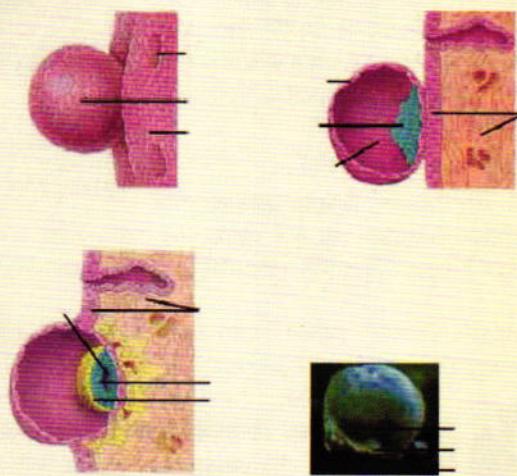
ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি

মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাক হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালে জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।" (সূরা আল হাজ্ব: ৫)

চার সপ্তাহের শেষে এমব্রিও সাত মিঃমি হয়। কুরআনে এ অবস্থানকে মুদগাহ্ বলে

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।" (সূরা মু'মিনুন : ১২-১৪) আল্লাহ তায়ালা একটা চর্বিত গোশত পিণ্ডের আকারে দেন এবং হাড়গুলোকে গোশত দ্বারা ভরে দেন এবং হাড় মাংসগুলো আবার চর্ম দ্বারা আবৃত করে দেন। তখনই পিণ্ডটি অন্য এক জীবন অর্থাৎ মানবরূপে সৃষ্টি হয়। এটা কেবল আল্লাহ তায়ালার দয়া ও তার একক ইচ্ছা।

সন্তান উৎপাদনক্ষম উর্বর ডিম্বাণু কোষ বলের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলে গঠিত হয় যাকে ব্লাসটোসিস্ট বলে। এ বলের ভেতরটা তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তবে ব্লাসটোসিস্ট দুটো স্তর দ্বারা গঠিত।

১. বাহ্যিক পুষ্টি এবং ঝুলন্ত ট্রোফোব্লাসটিক স্তর (ট্রোফিনিউট্রিশন)

২. অভ্যন্তরীণ সেল ম্যাস কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যা Embryo এবং এর এ্যামনিয়ন ও ইয়োক স্যাককে সঠিকভাবে বাড়তে সাহায্য করে।

প্রায় ২৫ দিনের ১৪ সোমাইট এমব্রিওর অবস্থান এ চিত্রে পরিস্ফুটন করা হয়েছে। এ অবস্থানকেও কুরআনে মুদগাহ্ বলে।

ব্লাসটোসিস্ট যখন (৭ থেকে ১২ দিন) ইউটেরাইন ওয়ালের মধ্যে নিজকে প্রোথিত করতে সচেষ্ট হয় তখন অ্যামিনিয়টিক স্যাক চলতিভাবে একটোডার্ম গঠন করতে আরম্ভ করে যা ক্রমাগতভাবে ইনার সেল ম্যাস হতে সিটোট্রোফোব্লাসকে একটা ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা পৃথক রাখে। এমনি ভাবে চলতি অবস্থায় এনডোডার্ম হতে সঠিক ইয়োক স্যাক গঠন করে।

ইউটেরাসে Embryo প্রাথিত করার ব্যাপারটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে ইনার সেল ম্যাসে কী ঘটে তা আলোচনা করা হবে। এমব্রিওনিক লাইফের তৃতীয় সপ্তাহে বাইলেমিনার (দু'টো স্তর) এমব্রি ট্রিলামিনার (তিনটি স্তর) এমব্রিওতে পরিবর্তিত হয়। আর একটোডার্ম এর সারফেসে মৌলিক আঁকাবাঁকা দাগ গঠিত হয় এবং মাথার দিকে একটা নটে শেষ হয়, যাকে মৌলিক নট অথবা নোড বলা হয়।

সোমাইটস গঠন (Formation of Somites)

তৃতীয় সপ্তাহ শেষে নটোকর্ড এবং নিউরাল টিউবের প্রত্যেক পার্শ্বে মেসোডার্ম পুরু হয়ে প্যারাকসিয়াল মেসোডার্ম এর দীর্ঘ কলাম গঠন করে। এটাই একসিস এর নিকট পুরু মেসোডার্ম। এটা অতিসত্ত্বর ইপিথেলয়েড সেলস (Epitheloid Cells)- এর খণ্ড ব্লকে বিভক্ত হয় যাকে সোমাইটস বলে।

সোমাইটসের প্রথম জোড়া এমব্রিওর ক্রেনিয়াল (মাথার দিকে) প্রান্ত ১৯-২১ দিনে প্রকাশ পায়। তবে পরবর্তীতে প্রতিদিন সোমাইটস হতে তিন জোড়া করে নতুন সোমাইটস গঠিত হয়। পঞ্চম সপ্তাহের শেষের দিকে ৪২-৪৪ জোড়া সোমাইটস গঠিত হয়। এটা হলো চার জোড়া অকসিপিটাল, আট জোড়া সারভাইকাল, বার জোড়া থোরাসিক, পাঁচ জোড়া লামবার, পাঁচ জোড়া স্যাকরাল এবং আট থেকে দশ জোড়া কক্সিজিয়াল। প্রথম অকসিপিটাল এবং শেষ ৫-৭ কক্কিক্স অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বাকিগুলো ভারটিব্রাল কলাম এবং স্কালের অংশ বিশেষ গঠন করে।

২০ দিনের এমব্রিও সোমাইটর এর প্রথম জোড়া পরিলক্ষিত হবার চিত্র।

হ্যামলিটন, বয়েড এবং মসম্যানের মতে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সোমাইটস এমব্রিওর সুস্পষ্ট ফিচারস স্পষ্টতা পৃষ্ঠদেশ পরিমণ্ডলে দেখা যায়। এটা হলো সেই ভিত্তিমূল যেখান থেকে মেরুদণ্ড, হাড় এবং মাংস বেড়ে ওঠে।

এমব্রিওর বয়স কতো, তা কতো জোড়া সোমাইটস দ্বারা গঠিত হয় তা তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। কুরআনে বর্ণিত মুদগা, সোমাইটসের চেয়ে অনেক সঠিক। মগা অথবা দন্তচিহ্ন সম্বলিত চর্বিত মাংস পিণ্ড যা কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আছে তা কিন্তু সোমাইটসে সেভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে ফ্যারেনজিয়াল আর্চ হতে মুখমণ্ডল, কান, নাকের অংশের বিশেষ গঠনের নিদর্শন আছে।

"সোমাইট পিরিয়ড অব ডেভেলপমেন্ট' ফ্যারেনজিয়াল আর্চ অন্তর্ভুক্ত নেই যদিও এটা একটা যুগান্তকারী স্তর। কিন্তু মুদগা শব্দটি এ স্তরের জন্য গুরুত্ব বহন করে।

মুদগাহ্ থেকে সোমইটস্

পবিত্র কুরআনে মুদগাকে মুখালাগা এবং নন মুখালাগা টার্মস এ বিভক্ত করে অর্থাৎ একটা পার্থক্য করে, অন্যটা পার্থক্য করে না।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এমব্রিওর পার্থক্যকরণ সেল কেবল চতুর্থ সপ্তাহ থেকে অষ্টম সপ্তাহে ঘটে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনটি জার্মালেয়ারের প্রত্যেকটি বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্ম দেয়।

বড় ধরনের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অরগান সিস্টেমের গঠন ৪-৮ সপ্তাহে হয়ে থাকে। এই সময়কালকে অরগানোজেনিসিস বলে। এটা সেই সময় যখন এমব্রিও ঐ সকল মধ্যবর্তী উৎপাদকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় যা ক্রমবিকাশ এবং জন্মাবধি বিকৃত গঠন ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। সেই দুঃসময় তারা তাদের মূল খুঁজে পায়।

এক্ষেত্রে কুরআনের মুখালাগা এবং নানা মুখালাগার বর্ণনা বহু চমৎকার।

মুদগা হলো চর্বিত গোশত পিণ্ডের মতো। এটা দ্বারা গঠিত এবং অগঠিত অংশের কথা উল্লেখ আছে কুরআনে বর্ণিত আছে যে:

"আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাক হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভস্থিত রাখি। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পার।" (সূরা আল হজ : ৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাদিসে বর্ণিত আছে :

"৪২ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নুতফাহ যখন গর্ভাশয়ে স্থির হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে আকৃতি দান করা এবং কানে শোনা, দেখা, চর্ম, মাংস এবং হাড় গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান তখন সেই ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ তা'য়ালা এটা কি ছেলে বা মেয়ে সন্তান? আল্লাহ তায়ালা তখন যা মনস্থ করেন তাই সৃষ্টি করেন।" (মুসলিম)

মুসলিম ও বুখারী শরীফের অপর জায়গায় বর্ণিত আছে, "এক ফোঁটা নুতফাহ গর্ভাশয়ে পৌছা এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বা গর্ভপাত বা গর্ভে নষ্ট হওয়া পর্যন্ত একজন ফেরেশতা তা অনুসরণ করে।"

এ থেকে জানা যায় যে, এ সময় (ছয় সপ্তাহকাল) অরগানোজেনিসিস এ জিনিথ (শিরাবিন্দু) পরিলক্ষিত হয় যা দ্বারা কর্ণ, চক্ষু গঠনের পদ্ধতি, হাড়, মাংস এবং চামড়া গঠন হয়। এ জন্য প্রত্যেকটি অঙ্গের পৃথকীকরণ চিহ্নিত হয় এবং ত্বরিতভাবে গোনাডস থেকে টেসটিসে অথবা গর্ভাশয়ের পৃথকীকরণ পরিদৃষ্ট হয় (আল হাদিস)। বর্তমান সময় কালে জানা গেছে যে, ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ এর ৭ থেকে ৮ সপ্তাহে গোনাডস টেসটিস অথবা ওভারিতে পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু কুরআন ও হাদিসে ১৪ শত বছর পূর্বে এর পুর্ণ বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদিস থেকে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা স্মরণীয় ও প্রকাশিতব্য বটে। আজ পর্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞানীরাও এ তথ্যের কোন চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি বরং কুরআন ও হাদিসে তথ্যকে সঠিক পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

হাড় এবং মাংস গঠনপ্রণালি

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাক-এ। অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।" (সূরা মু'মিনুন : ১২-১৪)

মাংস পিণ্ড 'মুদগা' অস্থিপঞ্জরে পরিণত হয় এবং অস্থিপঞ্জর মাংস দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। পরে তা একটা নির্দিষ্ট সময় মানব আকৃতিতে পরিণত হয় এবং ১০ মাস ১০ দিন পর পূর্ণতা নিয়ে মাতৃগর্ভ হতে আল্লাহর হুকুমে পৃথিবীতে আসে এবং আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

হ্যামিলটন, বয়েড এবং মসম্যান বলেন সোমাইটস (somites) হলো একটা ভিত্তি যেখান হতে Axial Skeletion-এর একটা বড় অংশ এবং মাংসপেশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তথ্য অতীব সত্য এবং বিজ্ঞানসম্মত বলেই বর্তমান জগতের বিজ্ঞানী ও মানুষ একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। সারভাইকাল সোমাইটস ৫-৮ হতে আপার লিমব এবং প্রথম থোরাসিক সোমাইট, লোয়ার লিমব কেবল লামবার সোইটস ১-৫ এবং উপরে দু'টো স্যাকরাল সোমাইটস হতে গঠিত হয়। মাংস পিণ্ড 'মুদগা' অথবা Somatic Embryo কঙ্কালতন্ত্রে (Skeletal System) এ বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং সে কারণে তা পরবর্তীকালে মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

সোমাইটস্ থেকে পর্যাক্রমে হাড় ও মাংস গঠন

চতুর্থ সপ্তাহের পূর্বেই সোমাইট আলাদা হতে থাকে এবং সোমাইটের ভেনট্রোমিডিয়াল ম্যাস সেলস খুব ত্বরান্বিত গতিতে ফলপ্রসূ কর্মদক্ষতা দেখিয়ে থাকে। অপর পক্ষে ম্যাসেনকাইমাল (Mesenchymal) সেলস তখন ফাইব্রোব্লাসটস, কনড্রোব্লাসটস এবং অসটিওব্লাসটস থেকে আলাদা হতে থাকে। এ সকল সেলগুলো মেরুদণ্ডের দিকে চলতে থাকে যেখানে নটোকর্ড এবং নিউরাল টিউব গঠিত হয়। সোমাইট এর অংশ এসক্লিরোটোম (Sclerotome) নামে পরিচিত। ভারটিব্রাল কলাম এসক্লিরোটোম (Sclerotome) দ্বারা গঠিত হয় বা নটোকর্ড এবং নিউরাল টিউবের সম্মুখ দিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। পরে নিউরাল টিউব ভারটিব্রাল বডি হতে নির্গত খিলান দ্বারা আবৃত হয়। যখন নটোকর্ড প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়ে যায় তখন নটোকর্ড এর অবশিষ্ট অংশ ইন্টারভারটিব্রাল ডিসক্ এর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস পালপোসাস আকৃতিতে পাওয়া যায়।

সোমাইটের যে সেলগুলো এসক্লেরোটম গঠনে ব্যবহৃত হয় না তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক মায়োটম গঠন করে যা শরীর গঠনে মাংসের জোগান দেয় এবং উক্ত মাংস হাড়গুলোকে ঢেকে দিয়ে মানব আকৃতি গঠনে সহায়ক। হয়। সুতরাং এতে দেখা যায় যে, হাড় গঠনের অগ্রদূত এসক্লিরোটম প্রথম শ্রেণীবদ্ধ আকারে স্থান নেয় যাকে পরবর্তীতে মাংস গঠনের অগ্রদূত মাইয়োটম অনুসরণ করে থাকে। এরপরও চামড়া গঠনের অগ্রদূত ডারমাটম দ্বারা হাড় ও মাংস আবৃত হয়ে যায়।

৫ম সপ্তাহের শেষে সোমাইট স্টেজ এমব্রিও প্রাথমিকভাবে হায়ালাইন কারটিলেজ দ্বারা আবৃত হয়

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে হাড় শরীরের মাংস গঠনের অগ্রদূত। একবার হাড় গঠিত হলে তা মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। মুদগা হতে যখন অস্থিপঞ্জর গঠিত হতে থাকে তখনই তা মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। এটা উভয় ভারটিব্রাল কলাম এবং হাত ও পায়ের (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের) হাড় গঠনের প্রক্রিয়ায় দেখা যায়। ফোর লিমব এবং লোয়ার লিমব বাড যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তাহে উদ্ভব হয়। তবে প্রত্যেকটি মুকুল মেসেনকাইমাল (অবিভক্ত) সেলস দ্বারা তৈরি যা সোমইটসহ একটোডার্ম এর আবৃতকরণ সাদৃশ্য।

মুকুলের চূড়া (এ্যাপেকস) পৃষ্ঠদেশ (Ridge) গঠন করে ধীরে ধীরে মোটা হতে থাকে যা ম্যাসেনকাইম জন্মাতে এবং পৃথকীকরণে সাহায্য করে। কিছু কিছু ম্যাসেনকাইমাল সেলস কনড্রোব্লাসটসে পৃথকীকরণ হয়ে যায় যা দ্বারা ষষ্ঠ সপ্তাহে অস্থির হায়ালাইন কারটিলেজ মডেল গঠিত হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে ভ্রূণতত্ত্ববিদ ল্যাংম্যান বলেন: "হাড় গঠন মুকুলের ভিত্তিমূলে নিকটবর্তী ম্যাসেনকাইম এ ঘনায়ন অবস্থায় হাত-পায়ের মাংপেশির প্রথম লক্ষণ ভ্রূণ থেকে মানব শরীর গঠনের সপ্তম সপ্তাহে দেখা যায়। মানব ভ্রূণের এই ম্যাসেনকাইম সোমাটিক ম্যাসোডার্ম হতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে।" "লিমব বাড সবগুলো বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাংশপেশি টিস্যুগুলোর অপৃথকীকরণভাবে গ্রন্থি আকুঞ্চন ও ব্যাপ্তিকরণ সহায়ক পেশি হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।"

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কারটিলেজ মডেল প্রিমিটিভ মাসেলস্ গঠনের অগ্রদূত। যখন কারটিলেজ মডেল গঠিত হয় তখন তা মাংসপেশি দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে যে:

'পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা।" (সূরা মু'মিনুন : ১৪)

এ আয়াত দ্বারা বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। বুঝা যায় তারা কুরআন থেকে তাদের জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা সংগ্রহ করে পরে নিজ পরিভাষায় রূপ দিয়েছেন। এতে সত্যের কোন ঘাটতি হয়নি।

৭ম সপ্তাহে মাথার খুলির চিত্র, সেখানে রক্তশিরা ধীরে ধীরে অবস্থান নেয়

পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ আছে যে, "আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দেই।" (সূরা আল বাকারা : ২৫৯)

"নুন সুজুহা" শব্দ দ্বারা সংযোজন, তৈরি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে সৃষ্টির মূলে যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তার সৃষ্টির রূপ দিতে পারেন, তাতে অন্য কারো কোন হাত নেই। তিনি ইচ্ছা করলে, মৃত্যু দেন এবং মৃতকে জীবিত করেন।

ল্যাংমান মানব শরীরে হাড়ের ওপর গঠন সম্পর্কে বলেন-

"সময়ের সাথে সাথে সুচের মতো আকৃতিসম্পন্ন হাড়গুলো গঠিত হয় এবং ক্রমাগতভাবে প্রাইমারি অসিফিকেশন কেন্দ্র হতে পেরিফেরির দিকে বিস্তার লাভ করে।" এতে দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সংগে ল্যাংম্যানের বর্ণনার মিল আছে। নুন সুজুহা শব্দের অর্থ ল্যাংম্যানের বর্ণনাকে আরো পরিপোক্ত করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন কত সুন্দর বিজ্ঞান এবং ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা কতোই স্পষ্ট এবং নিরংকুশ। মানুষের ভাষায় এর চেয়ে আর কোন ধারণাও চিন্তা করা যায় না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

৬ সপ্তাহের এমব্রিও ১.৫ মিঃ মিঃ লম্বা হয় এবং এ্যামনিয়টিক পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে সাঁতার কেটে বেড়ায়

৬ সপ্তাহের এমব্রিওর অবস্থান। হার্ট ঠিক থুতনি বরাবর নিচে অবস্থান করে

৮ সপ্তাহের এমব্রিওতে কার্টিজিনাস স্কেলিটন এর মধ্যে অস্থি গঠনপ্রক্রিয়া

১০ সপ্তাহে এ্যামব্রিওর অবস্থা

তথ্যসূত্র :

১. ডাঃ মুহাম্মদ আলী আলবার, কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ
২. Langman Medical Embryology
৩. ইবনে জারির আল তাবারী, জামিয়েল বায়ান ফি তাফসীর আল কুরআন
৪. ইবনে হাজার আল আসকালানী : "ফাহেত আল বারী সারীহ আল-বুখারী" বাব আল কদর
৫. ইবন আল কাইয়ূম : আল তিবিয়ান আল আকসাম আল কুরআন
৬. Keith Moore : The Developing Human
৭. Hamilton, Boid and mossman : Human Embryology
৮. Bradley paten: Foundation of Embryology
৯. Miracle of Human Creation: Harun Yahya.
১০. www. harunyaha. com

সঙ্কলনে

Md. Meftah-ul Islam
4th Year, Dhaka Medical College
e-mail: mefthk 62dmc@yahoo.com

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

ভূমিকা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে বুঝতে হলে আমাদেরকে সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা রাখতে হবে। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানই নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, এক কথায় সমস্ত সভ্যতারই ইতিহাস হচ্ছে যে, তা রাতারাতি আজকের এ অবস্থায় উপনীত হয়নি। এটি বহুলোকের বহুদিনের শ্রমের ফসল। সভ্যতার মশাল প্রজ্বলিত হয়েছিল হাজার বছর আগে। দেশ থেকে দেশে এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে তা হস্তান্তরিত হয়েছে। সভ্যতা তাদেরকেই পথ দেখিয়েছে যারা তার মশালকে উজ্জ্বলতার সাথে প্রজ্বলিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মিসরীয়, গ্রিক, রৌমীয়, পারস্য, ভারতীয়, চীন এবং ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের মত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি 'ফাঁকাস্থান' লক্ষ করা যায়। সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সময়টিকে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ অত্যন্ত পরিহাসের সাথে "অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। তাদের চিন্তা- চেতনার দৌড় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে ছিল না একেবারেই। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার। এ সময়ে সভ্যতার মশালটি লালিত হয়েছিল মুসলমানদের, বিশেষত আরবদের হাতে। বোধ করি, এ কারণেই পাশ্চাত্যের এই অস্বীকৃতি। এ লেখাটি মূলত ইতিহাসের অস্পষ্ট পাতাগুলো থেকে ধুলো ঝেড়ে বর্তমান সময়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নিকট তাকে স্পষ্ট করে তোলার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ইসলাম এবং সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিকাশ

নবী মুহাম্মাদ (সা.) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার সময় আরবজাতি অভ্যন্তরীণ কোন্দল, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতিতে ছিল জর্জরিত। এই অশিক্ষিত, বর্বর একটি জাতির মধ্য থেকে কুরআনের মহিমাগুণে তিনি (সা.) এমন একটি জাতির উদ্ভব ঘটালেন যারা, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একই সঙ্গে পারস্য ও বাইজানটাইনের (কনস্ট্যানটিনোপল) মতো বৃহৎ সভ্যতাকে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিল। খুব দ্রুত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূর্বে চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। নবীর (সা) ওফাতের মাত্র ৮০ বছরের মধ্যে মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশ করে এবং ৭০০ বছর তার শাসনভার অটুট রাখে। পরবর্তীকালে প্যারিস, রোম, সিসিলি, মালটা, আলপাইন পর্বতমালা পার হয়ে মধ্য ইউরোপে তারা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পি কে হিট্টির মতে, এ সময় ইতালির দক্ষিণভাগে এবং সিসিলিতে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে ওঠে যার মাধ্যমেই মূলত জ্ঞানের মশাল ইউরোপে পৌছে।

মুসলিম শাসনামলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তারা শাসিত রাজ্যের সংস্কৃতিকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করতো। পক্ষান্তরে মোঙ্গলরা বিদ্বেষের কারণে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদকে জ্বালিয়ে দেয় যার ফলে ইসলামী শিল্প ও বিজ্ঞান প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়ে। নদীতে নিক্ষেপ করে, রান্না-বান্নার কাজে এবং স্তূপে আগুন দিয়ে তারা ধ্বংস করেছে অমূল্য পাণ্ডুলিপি। তারা জানতেন না সেদিন তারা কী করেছিল। ১৬শ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী রামুস মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাজারে ইবনুল হাইছামের একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন পুরনো এক বইয়ের দোকানে ধূলি বালিময় ছেঁড়া ঐ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়ে তিনি এমনই আনন্দিত হন যে, যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিকাশে মুসলমানরা যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল ইসলামের গঠনমূলক শিক্ষার কারণে–

১. জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান
২. ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধকরণ
৩. পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ
৪. নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন
৫. অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা

চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় মুসলিমদের অবদান

আল রাজী, ইবনে সিনা এবং ইবন যুহরের মত খ্যাতনামা মুসলিম চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষানবিস চিকিৎসকদের শিক্ষা প্রদানেও বড় ভূমিকা পালন করতেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো খুবই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। এর মধ্যে ছিল শিক্ষামূলক বক্তৃতা (Lecture) এবং শয্যাপাশে ছাত্রের জন্য শিক্ষা সেশন (Clinical Session) । আল রাজী একজন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করার সময় ছাত্রদেরকে সেই রোগের লক্ষণগুলো (Symptoms) মনে রাখতে পরামর্শ দিতেন। তারা

একজন রোগীকে পর্যবেক্ষণের পর তাকে ছাত্রদের কাছে গুছিয়ে উপস্থাপন করতেন। শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে রোগীর ইতিহাস (Patient's History) এবং ব্যবস্থাপত্র (Prescription) সংরক্ষণ করা হতো। প্রয়োজনে রেজিস্ট্রার খাতাও মেনে চলা হতো। আজকের দিনের একজন (Clinical Student) তার হাসপাতালের ওয়ার্ডের ক্লাসকে নিঃসন্দেহে উপরের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষা অর্জন নিম্নলিখিত কয়েকটি দাপে সম্পন্ন হতো :

১. মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন- চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী ছাত্রদেরকে প্রথমে প্রাইভেট টিউটর এবং প্রাইভেট লেকচারের মাধ্যমে মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হতো। এসব বিষয়ের মধ্যে ছিল ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy), আলকেমি, ঔষধি গুল্ম (Medicinal Herbs), Pharmacology। অনেক হাসপাতাল রোগীদের ঔষধ তৈরি এবং ছাত্রদের পাঠদানের সুবিধার্থে নিজেরাই বাগান গড়ে তুলতো।

ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (Anatomy) প্রশিক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রশিক্ষণ

২. হাসপাতালে নিয়োগ লাভ-

মৌলিক শিক্ষা অর্জনের পর একজন ছাত্রকে শিক্ষানবিস চিকিৎসক (Apprentice Physician or Clinical Clerk) হিসেবে একজন তরুণ চিকিৎসকের অধীনে দলবদ্ধভাবে নিযুক্ত করা হতো। এ সময়টিকে বলা হতো প্রি-ক্লিনিক্যাল পিরিয়ড (pre-clinical period) । এ সময় একজন শিক্ষানবিস বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ, প্রাথমিক আলোচনাসমূহ এবং পাঠাগারের পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতেন। এ সময়ের সিলেবাসে Pharmacology, Toxicology Use of antidotes এর উপরে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হতো।

ঔষধি গুল্ম, সাহায্যে চিকিৎসার উদ্ভাবক মুসলমানরাই

৩. হাসপাতালে রোগীর শয্যাপাশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ- এটি ছিল নিয়োগলাভের পরবর্তী ধাপ। এ সময়ে স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে ওয়ার্ড রাউন্ডস (Ward rounds), আলোচনা (Discussion), বক্তৃতা (Lectures), এবং পুনরীক্ষণ (Reviews)- এ অংশ নিতে হতো। এ সময়ের প্রথমদিকে ছাত্রদেরকে পড়ানো হতো রোগ চিকিৎসাবিদ্যা (Therapeutics) এবং রোগবিদ্যা (pathology)। পড়াশোনায় অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ছাত্রদেরকে বেশি বেশি রোগ নির্ণয় করতে হতো। শয্যাপাশে রোগীকে পর্যবেক্ষণ (Clinical observation) এবং পরীক্ষার ওপরে বেশি জোর দেয়া হতো। ছাত্রদেরকে একজন রোগীর পরীক্ষা শেষে রোগ নির্ণয় করতে বলা হতো। ছাত্র তা করতে ব্যর্থ হলে অধ্যাপক নিজে করে তা তাকে বুঝিয়ে দিতেন। রোগীকে পীরক্ষা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হতো- রোগীর ক্রিয়াকর্ম, বর্জ্য নির্গমন, ব্যথার সহন ও প্রকৃতি, কোন স্থানে স্ফীতি (Swelling) কোন নিৎসরণ (Effluvia) এ ছাড়াও তাকে রোগীর ত্বকের উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা-শুষ্কতা, হরিদ্রাবর্ণ প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করতে হতো। মোট কথা, আজকের দিনের সাধারণ পরীক্ষার (General Examination) খুব অল্প পয়েন্ট-ই বাদ ছিল।

রোগীর শয্যাপাশে প্রশিক্ষণ

৪. বহির্বিভাগে স্থানান্তর- ওয়ার্ডের কার্যাবলি সাফাল্যের সাথে সমাপ্ত করার পর একজন ছাত্রকে বহির্বিভাগে স্থানান্তরিত করা হতো। সেখানে তারা নতুন রোগীকে পরীক্ষা করে শিক্ষকের কাছে তা পেশ করতো এবং তার সাথে আলোচনার পর ব্যবস্থাপত্র দেয়ার অভ্যাস করতো। বেশি অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। ছাত্রদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এসব রোগীর রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

পাঠক্রম

চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যক্রমে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **Internal Medicine-** রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন ছাত্রের জ্ঞানের স্পষ্টতা এবং স্বল্পসংখ্যক লক্ষণের ভিত্তিতে দ্রুত রোগ নির্ণয় ছাড়াও অন্য রোগ থেকে তাকে পৃথকীকরণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হতো। ইবনে সিনার সময় পর্যন্ত মেনিনজাইটিস (meningitis) এবং বিকারগ্রস্ত তরুণ সংক্রমণ (Acute Infection accompanied by Delirium) এর মধ্যে পার্থক্য করার মতো সামান্য জ্ঞানই চিকিৎসকদের কাছে ছিল। ইবনে সিনা মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলো এত স্পষ্টতার সাথে এবং স্বল্প কথায় বর্ণনা করেন যে, আজ এক হাজার বছর পরও তাঁর কথার সাথে খুব সামান্য যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক শল্যচিকিৎসা

২. **Surgery-** আগ্রহী ছাত্রদের ট্রেনিং শেষ করার পর শল্যচিকিৎসায় নিয়োগ দেয়া হতো এবং তা হতো খ্যাতনামা এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে। অসংখ্য শল্যচিকিৎসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অঙ্গকর্তন (Amputation), স্ফীত শিরার কর্তন (Excision of Varicose veins), অর্শ (Haemorrhoids) প্রভৃতির চিকিৎসা।

৩. **Orthopedics-** হাড়ভাঙা রোগীর হাড়জোড়া দিতে Plaster of Paris-এর ব্যবহার মুসলিম চিকিৎসকদের আরেকটি অনবদ্য উদ্ভাবন। ছাত্রদেরকে দেখানো হতো ভাঙা স্থানটি আগের অবস্থানে নিয়ে (Reduction) কিভাবে Plaster of Paris প্রয়োগ করতে হয়। অন্যদিকে পশ্চিমারা ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তা পুনরায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়।

৪. **Ophthalmology** চিকিৎসকরা এ বিষয়ে চিকিৎসা দিলেও নবীন চিকিৎসকদেরকে এ ব্যাপারে খুব বেশি শিক্ষা দেয়া হতো না। বিশেষভাবে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের অধীনে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষেই কেবলমাত্র চক্ষু চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেত। এ সবের মধ্যে চোখের ছানি (Cataract) অপারেশন ছিল সাধারণ ঘটনা।

Plaster of Parisf এর উদ্ভাবক মুসলমান চিকিৎসকগণ

Plaster of Paris- এর ব্যবহার

চোখের ছানি অপারেশন

৫. **Obstetrics-** এটি শুধু ধাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

৬. **Psychotherapy-** ইবনে সিনা এবং রাজী উভয়েই মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন ব্যাপকভাবে। প্রশিক্ষণ শেষে একজন নবীন চিকিৎসক অনুমতি পরীক্ষায় (Licensing Examination) পাস করার পরই কেবল স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে পারতেন। এ আলোচনা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম দক্ষতার পেছনে যে কারণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলো নিরূপ-

১. উপযুক্ত পাঠ্যক্রম
২. পাঠদানের ধারাবাহিকতা
৩. ছাত্রদের আন্তরিকতা
৪. পড়াশোনার মানের ক্ষেত্রে আপসহীনতা
৫. সিনিয়র চিকিৎসকগণের শেখানোর ব্যাপারে আন্তরিকতা
৬.অধ্যাপকবৃন্দের সাথে ছাত্রদের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক
৭. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা লাভ
৮. নিখুঁত পরীক্ষা পদ্ধতি

মানসিক রোগীর বর্বর চিকিৎসা পদ্ধতি; মুসলমানরা এর পরিবর্তন করেন

৯. অনুমতি প্রদানে সতর্কতা

১০. চিকিৎসাক্ষেত্রে শাসকগণের সরাসরি ইতিবাচক পদক্ষেপ

এ জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান চিকিৎসকের সামনে হাজির হয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। যে বিষয়ে বা বিভাগে সনদ লাভ করতে ইচ্ছুক, পরীক্ষার্থীকে সে বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করতে হতো (একে বর্তমান কালের থিসিস (Thesis) বা গবেষণার সাথে তুলনা করা যেতে পারে)। স্বয়ং পরীক্ষার্থীকে এ থিসিস রচনা করতে হতো অথবা অন্য ছাত্রের রচিত পুস্তিকার ওপর টীকা (Article) সংযোজন এবং সমালোচনা (Criticism) লিখতে হতো। প্রধান চিকিৎসক ছাত্রের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুলচেরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতেন। ছাত্রের জবাবে-প্রধান চিকিৎসক সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাকে প্র্যাকটিসের অনুমতি দেয়া হতো। ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের একটি ঘটনা। খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনামলে কোনও একজন চিকিৎসক রোগীর ভুল চিকিৎসা করেন। ফলে রোগীটি মারা যায়। খলিা তখন বাগদাদের সমস্ত চিকিৎসকদের নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেন। প্রধান চিকিৎসক সিনান ইবনে সাবিত সকল চিকিৎসকের নব পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এ নির্দেশের প্রথম বছরে শুধুমাত্র বাগদাদেই ৮৬০ জন চিকিৎসকের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
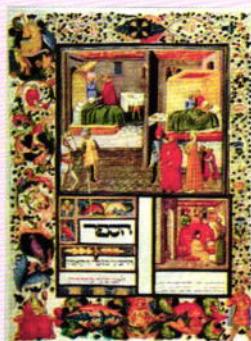
মুসলমান চিকিৎসকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি লাইব্রেরি

মুসলমান চিকিৎসকদের অবদানের উপর রচিত কয়েকটি বই

চিকিৎসাবিজ্ঞানে লাইব্রেরি

প্রত্যেক হাসপাতালে একটি করে লাইব্রেরি ছিল। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই এর দ্বারা উপকৃত হতেন। কথিত আছে, কায়রোর ইবনে তুলুন হাসপাতালে এক লাখ গ্রন্থ সম্বলিত একটি লাইব্রেরি ছিল। এতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক এবং বিভাগ সম্পর্কে গ্রন্থ ছিল।

মুসলমান ঐতিহ্য, গ্রানাডা হস্‌পিটাল

মুসলিম হাসপাতাল

মুসলিম শাসনামলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন তাদের অনুপ্রেরণা। স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ছিল বলে জানা যায়। খন্দক যুদ্ধকালে এটি স্থাপিত হয়েছিল। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে মুসলমানরা প্রথম স্থায়ী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। হাসপাতালগুলো ধর্ম, বর্ণ, বয়স, সামাজিক অবস্থান নির্বিচারে সকল নাগরিকের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতো। হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলা রোগীর জন্য আলাদা ওয়ার্ড ছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন উপসর্গ যেমন জ্বর, আঘাত, সংক্রমণ, চক্ষুরোগ, ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা, ডায়রিয়া এবং মহিলাদের সমস্যার জন্য আলাদা বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। রোগমুক্তির পর্যায়ে যারা ছিল (at the stage of convalescence) তাদের জন্য ছিল পৃথক ওয়ার্ড। প্রতিটি বিভাগের একজন ইনচার্জ থাকতেন, তাকে 'সাউদ' বলা হতো। চিকিৎসকদের জন্য ডিউটির সময় নির্দিষ্ট ছিল। নির্ধারিত সময়ে তাঁরা স্ব-স্ব বিভাগে উপস্থিত থেকে রোগী দেখতেন।
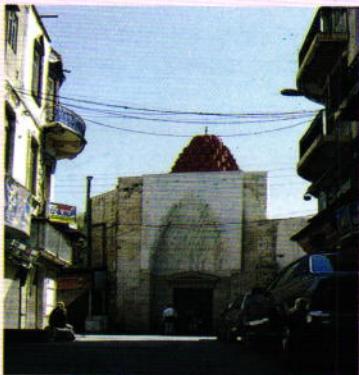
আল নূরী হাসপাতাল, দামেস্ক

ধ্বংসপ্রায় গ্রানাডা হসপিটালের অপর একটি অংশ

ছাত্র এবং হাসপাতাল কর্মচারীদের জন্য হাসপাতাল সংলগ্ন এলকায় বাসস্থান নির্মিত ছিল। রোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্যও আলাদা বিভাগ পরিচালিত হতো। চিকিৎসা সচেতনতা, রোগ সচেতনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য হাসপাতালের আলাদা হলে বক্তৃতার মঞ্চের ব্যবস্থা থাকতো। সাদা ধবধবে রেশমি বস্ত্র আচ্ছাদিত মনোরম পরিবেশে হাসপাতালের শয্যাগুলো থরে থরে সাজানো থাকতো। প্রতিটি কক্ষেই প্রবহমান বিশুদ্ধ পানির সু-বন্দোবস্ত থাকতো। গোছলখানাসমূহে রোগীদের উপযোগী ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতালে অবস্থানকালীন দেয়া হতো জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পরিধেয় এবং তোয়ালে। এসব হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সাথে আজকের অত্যাধুনিক হাসপাতালগুলোরও তুলনা করা যায় না। সে হাসপাতালসমূহে রোগীদের প্রয়োজন এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন হালাল পশু-পাখির গোশত, ফলফলাদি, চমৎকার ধরনের মাজুন বা অবলেহ এবং উত্তম ধরনের মোরব্বা সরবরাহ করা হতো। এখানে এমন অনেক পথ্য ছিল যা হাসপাতালের বাইরে পাওয়া যেত না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হিজরি ৮৩১ সালে জনৈক ভিনদেশী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি দামেস্ক সফরে আগমন করেন। তিনি আল নূরী হাসপাতাল দেখতে যান। হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা, রোগীর প্রতি চিকিৎসকের দরদ এবং আন্তরিকতা, রোগীদের জন্য নানারকম খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেখে তিনি বিস্মিত হন। চিকিৎসকদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে রোগী সেজে তিন দিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। চিকিৎসকগণ প্রথম দিনেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, মূলত তিনি রোগী নন, চিকিৎসকদের পরীক্ষা করার জন্যই তিনি রোগী সেজেছেন মাত্র। তা সত্ত্বেও তিন দিনব্যাপী তাকে আড়ম্বরপূর্ণ খাবার, মোটা তাজা মুরগি, হালুয়া, উন্নতমানের শরবত, নানারকম ফলমূল ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করেন এবং তৃতীয় দিন প্রধান চিকিৎসক তাকে একখানা চিঠি দেন যার বিষয়বস্তু ছিল "এখানে তিন দিনের বেশি আতিথেয়তার রেওয়াজ নেই"। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, চিকিৎসকরা তার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন।

আল কায়রাওয়ান হাসপাতাল

আল কায়রাওয়ান হাসপাতাল

হাসপাতালের নিজস্ব ফার্মেসি ছিল যা থেকে রোগীদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হতো। যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারতো। এজন্য তার কাছ থেকে কোন ফিস বা বিনিময় মুল্য গ্রহণ করা হতো না। আমীর, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর নিকট-দূর, দেশী-বিদেশী এবং সাধারণ-অসাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগীদের ভালভাবে দেখা হতো। রোগ হালকা হলে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়া হতো। যাকে ভর্তি করা প্রয়োজনীয় মনে হতো তার নাম ঠিকানা নোট করা হতো।

তাকে হাম্মামখানায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, হাসপাতালের বিশেষ পোশাক পরানো হতো, পুরাতন পোশাক একটি বিশেষ স্টোরে জমা রাখা হতো। রোগী সব দিক থেকে সুস্থ হলে তাকে এক নতুন পোশাক এবং কিছু নগদ টাকা (জানা যায়, ৫টি স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় দেয়া হতো।

প্রত্যেক হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্সপেক্টর থাকতেন। একাউন্ট্যান্ট এবং অন্যান্য অফিসারও নিযুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু দেশের শাসনকর্তা নিজে রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন,তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। হাসপাতালসমূহে ইবাদতের জন্য পৃথক স্থান ছিল। মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য রাতের বেলা কুরআন তিলাওয়াত, গল্প এবং প্রয়োজনে হালকা বাদ্য শোনানো হতো। মুসলিম জাহানের সকল হাসপাতালেই এই উন্নততর ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। বাগদাদ, দামেস্ক, বায়তুল মুকাদ্দাস, মক্কা, মদিনা এবং স্পেনে সকল হাসপাতালেই এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পৃথক ভাবে প্রতিটি হাসপাতালের বর্ণনায় না গিয়ে শুধুমাত্র তাদের নামোল্লেখ করা হলো।

হাসপাতালের নাম	অবস্থান
আল-নূরী হাসপাতাল আল-সালাহানি হাসপাতাল	দমেস্ক জেরুজালেম
আল- সাইয়্যিদাহ হাসপাতাল আল মুক্তাদির হাসপাতাল আল- আদুদি হাসপাতাল	ইরাক ও পারস্য
আল-ফুস্তা হাসপাতাল আল- মানসুরি হাসপাতাল	মিসর
আল-কায়রাওয়ান হাসপাতাল দি মারাকেশ হাসপাতাল গ্রানাডা হাসপাতাল	তিউনিসিয়া মরক্কো স্পেন

বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম চিকিৎসকদের অবদান

ব্যাকটেরিওলজি (Bacteriology)

১. বাগদাদে আল রাজীর ওপর একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা নির্বাচনের জন্য একটি পরীক্ষাকার্য চালান।

হাসপাতালের জন্য বাগদাদের চারটি প্রস্তাবিত স্থানে চার খণ্ড গোশত রেখে দেয়া হয়।

প্রত্যেহ গোশতের টুকরাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা হতো। যে স্থানে রক্ষিত গোশতের টুকরাটি পচে যায়নি, হাসপাতালের জন্য তাকেই সমীচীন মনে করা হলো এবং সেখানেই হাসপাতালটি নির্মাণ করা হলো। এটি ডা. রাজীর অন্তর্নিহিত জ্ঞানের ছোট্ট একটি পরিচয় বহন করে। তিনিই প্রথম এ্যালকোহলকে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার করেন।

২. ইবনে সিনা সর্বপ্রথম যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণের প্রকৃতি নিরূপণ করেন। তিনি ক্ষতস্থানের ড্রেসিংয়ের জন্য মদের ব্যবহারকে সুপারিশ করেছেন।

অ্যানসথেসিওলজি (Anesthesiolog)

ইবনে সিনা সর্বপ্রথম মুখে গ্রহণযোগ্য চেতনানাশক (Oral Anesthetics) এর ধারণা দেন। তিনি আফিমকে (Opium) সবচেয়ে শক্তিশালী বলে উল্লেখ
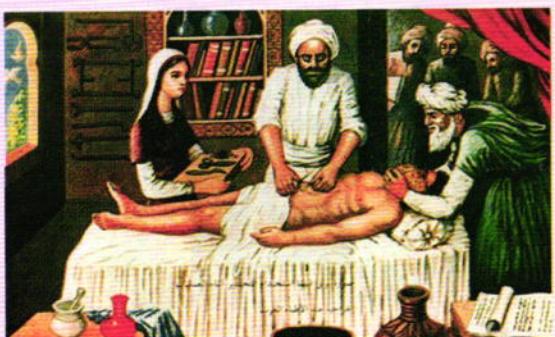
সর্বপ্রথম চেতনানাশকের ধারণা প্রদান করেন ইবনে সিনা

করেন। এ ছাড়াও কম শক্তিশালী চেতনানাশক হিসেবে মন্দ্রাগোরা (mandrogora), পপি (Poppy), হেমলক (hemlock), হায়োসায়ামাস (hyoscyamus), বেলাডোনা (belladonna), লেটুস বীজ (lettuss seed), এবং তুষার কিংবা বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি (Snow or ice cold water) ব্যবহার করতেন। আরবরা নিদ্রাজনক স্পঞ্জ উদ্ভাবন করেছিলেন। এটি ছিল অ্যারোমেটিক যৌগ (Aromatis) এবং নারকোটিক (Narcotic) যৌগের তরল মিশ্রণে সিক্ত স্পঞ্জ বিশেষ যা রোগীর নাকের সামনে ধরা হতো। ইসলামিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সার্জারির উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল চেতনানাশকের উন্নত ব্যবহার।

আধুনিক চেতনানাশক পদ্ধতি

সার্জারি (Surgery)

আবু আল-কাসিম খালাফ ইবন আব্বাস আল-জাহরাভি (Abu al-Qasim Khalaf Ibn Abbas Al-Zaharawi (930-1013 A.D), পশ্চিমাদের নিকট যিনি অ্যালবুকাসিস, বুকাসিস অথবা আলজাহরাভিয়াস নামে পরিচিত; ছিলেন মুসলিম চিকিৎসকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সার্জন। তাঁর রচিত বই হচ্ছে 'আল তাসরিফ'। তিনিই সর্বপ্রথম হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বর্ণনা করেন। তাঁর বইতে তিনি প্রায় দুইশত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির (Surgical Instruments) সচিত্র বর্ণনা দেন। এর অনেকগুলো তাঁর নিজের উদ্ভাবিত। তিনি সার্জারির জন্য অ্যানাটমিকে (Anatomy) একটি অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। পড়ে যাওয়া দাঁতের পুনঃস্থাপন এবং কৃত্রিম দাঁত হিসেবে গরুর হাড়ের ব্যবহার তাঁর অন্যতম অবদান। জাহরাভিই প্রথম সার্জন যিনি রক্ত বন্ধ করার জন্য সার্জিক্যাল ড্রেসিং হিসেবে, হাড় ভাঙার চিকিৎসায় স্প্রিন্ট হিসেবে, প্যাড হিসেবে এবং দাঁতের চিকিৎসায় তুলা ব্যবহার করেন।

আল-জাহরাভি, সর্বপ্রথম হিমোফিলিয়া বর্ণনা করেন

তিনি মূত্রথলি কেটে কিডনির পাথর (Kidney stones) বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম যৌননালি অপারেশনের (Vaginal operation) লিথোটমি পজিশন (lithotomy position) শিক্ষা দেন। তিনি ট্রাকিওস্টমি (tracheostomy) বর্ণনা করেন, গয়টার (Goitre) এবং থাইরয়েডের ক্যান্সারের (Thyroid cancer) পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আয়রন কটরাইজেশন (Iron cauterization) তাঁর উদ্ভাবন। স্ফীত শিরার পৃথকীকরণ সংক্রান্ত তাঁর সেই সময়ের বর্ণনা আজ হাজার বছর পরের আধুনিক সার্জারির অনুরূপ।

আল-জাহরাভি উদ্ভাবিত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার বিধি

স্কন্ধসন্ধিচ্যুতির পুনঃস্থাপনের বর্তমানের বহুল পরিচিত 'আল তাসরীফ' ২ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ৩০টি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। বইটিকে সারটন medical Encyclopedia' নামে অভিহিত করেছেন। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে Britanica উল্লেখ করেছে, "Al-Tasif stood for nearly 500 years as the leading text book on surgery in Europe."
(Kocher's method of reduction of shoulder join বিজ্ঞানী ক্রুক ১৯৩৭ সালে পুনরায় আবিষ্কার করলেও এর প্রথম আবিষ্কর্তা ছিলেন আল-জাহরাভি।

ইবনে সিনা এক হাজার বছর আগে ক্যান্সারের যে শল্যচিকিৎসা (Surgical treatment) বর্ণনা করেন আজও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, "Excision must be wide and bold; all veins running to the tumor must be included in the amputation. Even if this is not sufficient, then the area affected should be cauterized."

আল-রাজী প্রথম ক্ষতস্থান সেলাইয়ে প্রাণীর পৌষ্টিক নালির ব্যবহার করেন। সেই সময়ে সার্জনরা তিন ধরনের সার্জারি করতেন: ভাসকুলার (Vascular) জেনারেল (General) এবং অর্থোপেডিক (Orthopaedic)

তাঁরা বর্তমানের আধুনিক সার্জারির মতই পেট কেটে পেরিটোনিয়োমের গহবরকে পরিষ্কার করতেন (Peritoneal Toileting) । লিভার অ্যাবসেস চিকিৎসা করা হতো ছিদ্র করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ।

মেডিসিন (Medicine)

এ ক্ষেত্রে আল-রাজীর সর্বোৎকৃষ্ট অবদান ছিল স্মল পক্স (Small pox) এবং মিসল (Measles) এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ । এ দুটি রোগকে তখন পর্যন্ত একটি বলে বিবেচনা করা হতো । বানরের ওপর পরীক্ষা করার পর পারদকে তিনি রেচক (Purgative) হিসেবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন । এ ছাড়াও পারদের মলম এবং সিসার মলম তিনি ব্যবহার করেন । মূত্র নিষ্কাশন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে তিনি সংক্রামক রোগ (Venereal disease), কিডনি অ্যাবসেস (Renal abscess), এবং কিডনি ও মূত্রথলি পাথরের চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখেন । তিনি (hay-fever) এবং অ্যালার্জিক সর্দি-হাঁচি (Allergic Rhinitis) বর্ণনা করেন ।

আল রাজী

রোগীর শয্যাপাশে আল রাজী

ইবনে সিনা

আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইব্‌ন যুহর (Ibn Zuhr) কর্তৃক স্ক্যাবিস (Scabies) এর জন্য দায়ী পতঙ্গের আবিষ্কার, ইবনে সিনা কর্তৃক অ্যানথ্রাক্স (Anthrax), অ্যাঙ্কাইলোস্টোম (Ankylostoma) এবং গিনি ওয়ার্ম (Guinea worm) আবিষ্কার । কালকাসান্দী (Qalqashandy) কর্তৃক নিদ্রা ও মস্তিষ্কের অসুস্থতা (Sleeping sickness) আবিষ্কার । ইবন যুহর প্রথম Gastric tube-র মাধ্যমে । Nutrient enema- এর প্রচলন করেন । আরব চিকিৎসাবিদগণ Stomach tube ব্যবহার করে Poisoning এর ক্ষেত্রে Gastric lavage দিতেন । ইবন আল-নাফীস সর্বপ্রথম Pulmonary circulation- পদ্ধতি বর্ণনা করেন । ইবনে সিনার Masterpiece হিসেবে পরিচিত Al-Qanun (Canon) তাঁর একটি অনবদ্য রচনা । প্রায় দশ লক্ষাধিক শব্দের বর্ণনা সম্বলিত এ রচনা কর্মটিতে physiology. Pathology এবং Hygine সম্পর্কে পরিষ্কার আলোচনা করা হয়েছে । তাঁর এ গ্রন্থটি ছয়শত বছর যাবৎ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যবই ছিল । Willium Osler তার Evolution of Modern Science বইতে লিখেছেন : "Al- Qanun has remained a medical Bible for a longer period than any other work."

ইবনে আল নাফীস প্রদর্শিত পালমোনারি সার্কুলেশন

তিনি বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেন সেগুলো হচ্ছে Breast cancer, poisons, diseases of the skin, rabies, insomnia, child birth and the use of obstetrical forceps, meningits, stomach ulcers, tuberculosis, facialtics, phlebotomy, tumors, kidney disease, এবং geriatric care.

ইবনে আল নাফিস
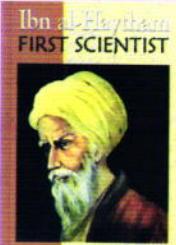
ইবনুল হাইছাম

Opthalmology

Canamusali নামে পাশ্চাত্যে পরিচিত ইরাকের চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবুল কাসেম আম্মার বিন আলী আল মওসুলী চোখের ছানি অপারেশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সারটনের মতে, The most original of Muslim Occulist. 'কিতাবুল মনতাখাব ফি এলাজিল আইন' আম্মারের চোখের রোগ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের বিশিষ্ট রচনা।

প্রখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ ও গণিতবিদ ইবনুল হাইছাম। (Ibnul Hytham) চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে এক যুগপৎ অবদান রেখেছেন। Physics ও Mothematics সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চোখের এনাটমি পরীক্ষা করে তিনি Scleroid, Cornea, Choroid, Lris প্রভৃতির পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি Retina, Optic nerve, aquous humour I vitreous humor এর কাজ আলোচনা করেন। বর্তমানের 'Lens'-ইংরেজি শব্দটি ইবনুল হাইছামের আরবিতে ব্যবহৃত 'অদাসা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'দাসা' অর্থ মসুরের ডাল, চোখের লেন্স মসুরের ডালের মত biconvex, ল্যাটিন অনুবাদকারী এই Lenticulum অদাসাকে তাই 'Lens' বলে অনুবাদ করেন। এই শব্দটি আজ Lens নামে পরিচিত হচ্ছে। ইবনুল হাইছামের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে চশমা আবিষ্কারের সাহায্য করে বলে তিনি চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ।

Pharmacology

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল বিরুনী চিকিৎসা বিষয়েও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে তিনি Pharmacy বিষয় নিয়ে লিখেছেন। হুনায়েন বিন ইসহাক আল-ইবাদি (Hunayn bin Ishaq al- Ibadi) তাঁর আল মাসায়েল (Al-Masail) গ্রন্থে "Methods For confirming the pharmacological effectivensss of drugs by experimenting with them on humans আলোচনা ছাড়াও Qvovl Importance of diagonosis and diagnosis for better and more effective treatment ব্যাখ্যা করেন।

Pharmacology-এর অন্যতম উৎস ঔষধি গুল্ম

Pharmacology- এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত ঔষধ

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ওষুধের নির্যাস সংগ্রহ এবং তা তৈরির জন্য Distillation, Crystallization, solution, sublimation, reduction and calcinations-এর যে সমস্ত পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন তা আজও Pharmacy এবং Chemistry-এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে তাঁরা অনেক নতুন ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম হন। Pharmacy এবং Chemistry-তে ব্যবহৃত অনেক শব্দ আরবি থেকে উদ্ভূত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- drug, alkali,alcohol, aldehydes, alembic, elixir, syrup এবং Juleps, আরব বিজ্ঞানীরা pharmacology বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিন্যাশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা মোটামুটি ৭ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. সমার্থ শব্দের গ্রন্থ (Synonymatic Treatises)
২. ব্যবস্থাপত্র সঙ্কলিত গ্রন্থ (Medical Formularies)
৩. ব্যবহারিক ওষুধ বিজ্ঞানের তালিকা (Materia Medica)
৪. বিকল্প ওষুধ (Substitute drugs

Pharmacology-ল্যাবরেটরী

৫. ফলাকারে সাজানো সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ (Tabular Synoptic Texts)
৬. বিষ ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ;
৭. চিকিৎসার কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ (Works on Medical specialities)

Psychotherpy

আল রাজীকে যখন বাগদাদ হাসপাতালের Physician-in-Chief হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি সেখানে মানসিক রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি ওয়ার্ড স্থাপন করেন। তিনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকের চিকিৎসা এক সাথে করতেন। একবার রাজীর ওপর একজন খলিফার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয় যিনি Severe Arthritis- এ ভুগছিলেন। রাজী তাঁকে গরম পানিতে গোসলের পরামর্শ দেন। যখন খলিফা গোসল করছিলেন তখন রাজী তখন রাজী একটি ছুরি হাতে খলিফাকে আক্রমণ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসেন। খলিফা উত্তেজিত হয়ে রাজীকে তারা করতে দৌড় দেন এবং তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। নাযাব উদ্দিন মোহাম্মদ অনেক ধরনের মানসিক রোগের বর্ণনা করেছেন। তিনি Agitated depression, obsessional types of neurosis সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

ইবন সিনা আবেগজনিত অসুস্থতার চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'Physiological psychology'পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। Pulse rate এর পরিবর্তন পরীক্ষা করে তিনি রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হন। একবার একজন প্রচণ্ড অসুস্থ রোগীকে তাঁর নিকট চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তিনি রোগীর Pulse অনুভব করতে থাকেন এবং শহরের নাম তাকে শোনাতে থাকেন। তিনি এভাবে বের করতে সমর্থ হন যে, রোগী একটি মেয়েকে পছন্দ করতো এবং মেয়েটি কোন শহরের অধিবাসী ছিল। ইবন সিনা রোগীকে মেয়েটিকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলে রোগী মেয়েটিকে বিয়ে করে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তিনি 'ভালবাসা' (Love) বিষয়টিকে মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তার যথার্থ চিকিৎসা করতেন।

একটি পর্যালোচনা

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে-

১. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির (Western Civilization) প্রায় নয়শ বছর আগে ইসলামী সংস্কৃতি (Islamic Civilization) চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চতর উদাহরণ স্থাপন করেছে।

২. এমন উন্নত মানবীয় অনুভূতি মানুষের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এবং ইনসাফের মূলনীতির ওপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ইতিহাসে যার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য জগতে অদ্যাবধি এ সকল অনুভূতি ও মূলনীতি দেখতে পাওয়া যায় না।

৩. সুমিষ্ট সুর, কৌতুক-সাহিত্য এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে রোগীকে জানতে দেয়া যে সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

৪. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাধীনে আমরা এমন উন্নত রেকর্ড স্থাপন করেছি যে, আজকের উন্নত যুগেও পাশ্চাত্য জাতি সে পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। রোগীদেরকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হতো, তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হতো প্রায় বিনামূল্যে। বরং চিকিৎসা লাভের পর গরিব-নিঃস্ব রোগীদের এতটুকু পুঁজিও দেয়া হতো, যাতে সে সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করতে পারে।

৫. সভ্য জগতে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা যখন আমাদের হাতে ছিল তখন মানবপ্রীতির এ উচ্চ শিখরে আমরা আরোহণ করেছিলাম। আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আর পাশ্চাত্য জগৎ কোথায়? আমরা কি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখছি?

উপসংহার

উপরোক্ত প্রবন্ধটি একটি বৃহৎ আলোচনার ক্ষুদ্র সার নির্যাস মাত্র। অনেক বিষয়কে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লেখায় স্থান দেয়া সম্ভব হলো না। যতটুকু আলোচিত হয়েছে আমরা আশা করি আমাদের সোনালি অতীতকে বর্তমান মুসলিম প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তা একটি প্রাথমিক প্রয়াস। এ প্রয়াসের

আলোকে বিজ্ঞানের বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীগণ নিজেদের উজ্জ্বলতর অতীতকে আরও বেশি করে জানার আগ্রহে উদ্দীপ্ত হবেন আশা করি। সেই অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের কারণ যতভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন তা একটি মাত্র গন্তেব্যে এসে গতি হারাবে আর তা হলো বিজ্ঞানীদের নিজেদের ধর্ম-দর্শনের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক। ইবন সিনার অনেক অবদানের কথা জানলেও আমরা হয়তো জানি না যে, তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে আল কুরআনের হাফেজ ছিলেন। আর বর্তমান সময়ে Living Miracle ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "We (the muslims) are back in science & Technology because we are deviating away from our religious book (The holy Quran), and the reason why the Western people are advanced in science and technology is thet they are also deviating away from their religious book." সমৃদ্ধ ইতিহাস যেমন আজকের মুসলিম তরুণদের জন্য গর্বের বিষয় তেমনি তাদের জন্য সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধারের একটি চ্যালেঞ্জও বটে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে কতটুকু সাহসিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দেই পৃথিবী আজ সেটি দেখার জন্যই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখক

Dr. S.M. Noor-E-Shadid Shinchon
MBBS,SSMC&MH, Dhaka,
shinchon30@gamail.com

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলাম

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্য আর গতিময়তা। স্বাভাবিক কর্মক্ষম মানুষ হওয়ার জন্য সুস্বাস্থ্যের বিকল্প নেই। কথা আছে, সুস্থ দেহে সুন্দর ও সুস্থ মনের মানুষ হওয়া যায়।

স্বাস্থ্য নামক এ নিয়ামত রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া জরুরি। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'স্বাস্থ্য' নামক এ নিয়ামতটি দান করেছেন। এ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন-আমাদের এ সুন্দর শরীর এবং স্বাস্থ্যকে আমরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছি এবং কিভাবে ব্যবহার করেছি। তিরমিযী থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) এর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত কেউ এক কদমও এগোতে পারবে না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, "সে তার স্বাস্থ্যকে কিভাবে ব্যবহার করেছে।"
এই রহমত-নিয়ামতের সংরক্ষণ শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের সঠিক যত্ন এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এটাকে মনে রেখেই সব মুসলমানকে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যত্নবান হওয়া জরুরি। সুস্থ জীবনযাপন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ১৪০০ বছর আগেই ইসলামে উল্লেখিত হয়েছে। অধিকন্তু কুরআন এবং সুন্নাহ প্রত্যেক মুসলমানকেই কিভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয় এবং পবিত্র জীবনযাপন করতে হয় তার একটি আউটলাইন শিখিয়েছে। ইসলামের স্বাস্থ্য রক্ষার অসংখ্য নির্দেশনা থেকে নিত্যে কতিপয় বাছাইকৃত উদাহরণ সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

১. ঈমান

ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে তাঁর গুণাবলির ওপর বিশ্বাস, ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস, আখিরাতের ওপর বিশ্বাস, জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর বিশ্বাস এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস। ইমাম রুমী নামাজের ওপর ঈমানের বা বিশ্বাসের স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ যখন তার দুর্বলতা বুঝতে পারে তখন তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস বেড়ে যায়। এবং সে স্রষ্টার নিকটবর্তী হয়। ঈমান বা বিশ্বাস ছাড়া নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ সবই অর্থহীন। ঈমান বা বিশ্বাস আমাদেরকে আমাদের চারদিকের অসংখ্য প্রভুর আনুগত্য থেকে মুক্ত করে এক প্রভুর আনুগত্য করতে শেখায়। আর বহুমুখী চিন্তা থেকে মুক্ত করে এক অনাবিল মানসিক প্রশান্তি দেয়। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করে ঈমান।

ঈমান মানুষকে নিরাশ করে না বরং সঙ্কটময় মুহূর্তেও মহান আল্লাহর সাহায্যের ভরসায় অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আখেরাতের স্থায়ী পাওনার জন্য পৃথিবীর সকল অভাব ও দুঃখ ভুলে যায়। কুরআন বলছে-

"যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বল: আমি তোমাদের খুব নিকটবর্তী। যখন তারা আমাকে ডাকে, তাদের ডাকের জবাব আমি দিয়ে থাকি।" (সূরা আল বাকারা : ১৮৬)

"আমার রহমত প্রতিটি জিনিসের ওপর প্রসারিত।" (সূরা আল আরাফ : ১৫৬)

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর পরম প্রশান্তি অনুভব করে।" (সূরা আর রা'দ : ২৮)

আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর জিকির (স্মরণ) করে আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো। (সহীহ বুখারী)

২. নামাজ :

নামাজের ভেতরে স্বাস্থ্যগত দু'টি বিষয় আছে-

ক) ওজু

এর অর্থ হচ্ছে দেহের বাহ্যিক অঙ্গগুলো যেমন-হাত, পা, মুখ, নাক ইত্যাদি ধৌত করা, দিনে পাঁচবার ওজু করা স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানকালে হাত ধোয়াতে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে হাসপাতালগুলোতে জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য। অমুসলিমরা আজ যে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে, আল কুরআন তা ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছে। পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার জন্য গোছলের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

নামাজ-মানসিক, আত্মিক পরিশুদ্ধির এক অন্যান্য উপায়

খ) কুরআন তেলাওয়াত

এ বিষয়টির একটি উপকারী প্রভাব রয়েছে দেহ, মন ও আত্মার ওপর। আরবি হরফ আলিফ-এর উচ্চারণ আমাদের হৃদপিণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলে এবং ইয়া শব্দের প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থির ওপর পড়ে। মহান আল্লাহ বলেছেন, হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে তার জন্য পথ নির্দেশনা ও রহমত। (সূরা ইউনুস-৫৭)

আল কুরআন- দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই এর রয়েছে সঠিক ও সুনিপুণ দিকনির্দেশনা

৩. যাকাত

যাকাত শব্দটির অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। এখানে পবিত্রতা বলতে সন্দেহজনকভাবে উপার্জিত সম্পদের পবিত্রতা বুঝিয়েছে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ অপরাধ সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। কুরআন বলছে, "এবং মানুষ সম্পদের নেশায় উগ্র হয়ে যায়'। (সূরা আদিয়াত-৮)

ইসলাম ধর্মে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ এবং আমাদের পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহতায়ালা সম্পদ দিয়েছেন। এ কারণে একজন প্রকৃত মুসমান নিঃস্ব অবস্থায়ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। উপরন্তু সে মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানায় সম্পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য।

যাকাত সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়

৪. সাওম

সাওম বা রোজা আমাদের শরীর এবং মনের প্রশিক্ষণস্বরূপ; আত্মসংযমের জন্য আরোপিত হয়েছে। কুরআন বলছে 'ওহে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারো।' রোজার সময় মুসলমান ব্যক্তি সোবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রকাশ্যে ও গোপনে পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, অসংলগ্ন কথা তো নয়ই বরং উচ্চস্বরে (ঝগড়ার মতো করে) কথাও বলে না। ফলে ব্যক্তির নফসের ওপর যে কন্ট্রোল তৈরি হয় তাতে শুধুমাত্র ধূমপান বা ক্ষতিকারক পানীয় বা এ জাতীয় অন্য কিছু থেকেই মুক্ত থাকতে পারে না, অধিকন্তু ক্রোধ এবং অসংযত যৌন ভাবাবেগ থেকেও রক্ষা পেতে পারে। মানসিক এ শক্তি তাকে তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

রোজা এবং পরিমিত ইফতার বহুবিধ জটিল রোগ থেকে রক্ষা করে

৫. হজ

হজ এসেছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর আল্লাহর প্রতি অপার আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের আদর্শ থেকে। অনুতাপের মহা সুযোগ নিয়ে, সর্বোপরি বর্ণ, জাতি ও দেশ নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলন এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বার্তা নিয়ে। যা হউক এটা ব্যবহার করা যেতে পারে শারীরিক সহিষ্ণুতার পরীক্ষাস্বরূপ। যা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য প্রয়োজনীয়। হজের দীর্ঘ পদযাত্রা, উষ্ণতা, তৃষ্ণা, আমাদের বিচার দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বয়সের অপেক্ষা না করে আমাদের যুবক অবস্থায় হজ করা উচিত। আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ভিত্তিস্বরূপ বিশ্বাসের খুঁটিগুলো বর্ণনার পর এবার শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার ব্যাপারে কথা বলা যাক। যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিরাজ করে।

হজ্জ - প্রত্যেক সামর্থ্যবান নর-নারীর ওপর হজ্জ ফরজ

পুষ্টি

আল্লাহ তার সৃষ্টিকে এতই বেশি ভালবাসেন যে, তারা কী খায় এ ব্যাপারেও তিনি সতর্ক। আমরা যা খাই তার কাঁচামাল থেকেই আমাদের পেশি, হাড় ফুসফুস, যকৃত, মস্তিষ্ক তৈরি। আমরা যদি এই যন্ত্ররূপ শরীরটাকে অবিশুদ্ধ, জীর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ করি, তবে তা ফলস্বরূপ মজবুত হাড়, শক্তিশালী পেশি, সুস্থ হৃদপিণ্ড এবং পরিষ্কার রক্তনালিকা উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হবে।

ফলমূল- মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য কোন জিনিসেরই অভাব নেই স্রষ্টার এই সৃষ্টিজগতে

'হে মানবজাতি, পৃথিবীতে তোমরা হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর।' (২:১৬৮)

'আল্লাহ যে সব খাদ্য বৈধ করেছেন তোমরা সে সব খাদ্য খাও। কিন্তু ভয় কর আল্লাহকে যাকে তোমরা বিশ্বাস কর।'

মানুষের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম মৃত প্রাণীর গোশত, রক্ত, শূকরের গোশত এবং নেশাজাতীয় পানীয় ও খাদ্য।' ৫:৯৩, ২:২১৯, ৫:৯১)

এ পর্যন্ত এ সব নিষিদ্ধ খাদ্যের মধ্যে উপকারী কোন দিক নিশ্চিত করা যায়নি। মৃত প্রাণীর গোশতে ও রক্তে অণুজীব ও অন্যান্য ক্ষতিকারক বস্তু যেমন অ্যান্টিবডি থাকতে পারে। শূকরের গোশত উচ্চ কোলেস্টেরল, লবণযুক্ত এমনকি জীবাণুও থাকতে পারে। অ্যালকোহল এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় বস্তু আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে এবং স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের অজান্তে বিবস্ত্র হতে পারে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, এমনকি যুক্ত হতে পারে বিপজ্জনক উগ্র কাজে।

পুষ্টির বিষয়ে খাবার নির্বাচনের পর দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে স্থূলতা বা মোটা হওয়া। শতকরা ৯৯ ভাগের ক্ষেত্রে এ কারণ হচ্ছে অত্যধিক খাবার গ্রহণ। মহান আল্লাহ এর সমাধান দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে, 'অপচয় কর না, কেননা আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা আল আ'রাফ; ৩৪১)

বিশুদ্ধ হাদিস মতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন, খাবারের সময় আমাদের পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখতে। হাদিসটির ভাষ্য আমি সেদিন বুঝতে পারি যেদিন বাড়ির ব্লেন্ডারটিকে (খাবার মিশ্রণ এবং চূর্ণকারী একটি যন্ত্র) ভেঙে ফেলেছিলাম এটিকে পূর্ণ করে সুইচ অন করতে গিয়ে। আমাদের পাকস্থলীও অনুরূপ একটি ব্লেন্ডার। অনিয়ন্ত্রিত খাবার
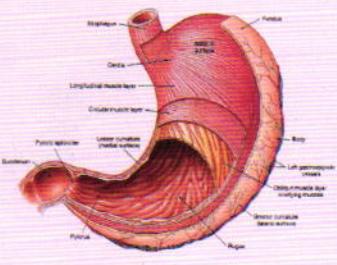
পাকস্থলী

পাকস্থলী-স্রার দেয়া ব্লান্ডার মেশিন যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে

ব্লেন্ডার মেশিন

গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

পবিত্র কুরআনের কিছু খাবার যেমন ফলকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে খেজুরের গাছ এবং আঙুরের ছড়া থেকে খাওয়াই যাকে তোমরা নেশার দ্রব্য বানিয়েছ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আন নাহল-৬৭)

ফলের উপাদানের মধ্যে রয়েছে নিু ক্যালরি। কিংবা উচ্চ ভিটামিন, মিনারেল এবং ফাইবারের মধ্যে রয়েছে ফ্রুক্টোজ (সুক্রোজ নয়) নামক চিনি। আধুনিক গবেষণায় ডা. এন্ডারসনস দেখিয়েছেন, ফ্রুক্টোজ রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা বাড়ায় না বরঞ্চ কমায় যা ডায়াবেটিকস রোগীদের বিশেষ উপকারী।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

মহান আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন। তিনি নিজে পরিচ্ছন্ন তাই পরিচ্ছন্ন লোকদের তিনি ভালোবাসেন। দেহে ও মনের পবিত্রতাকে কুরআনে একাধিক স্থানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (সূরা আন নিসা- ৪৩, সূরা মাদিয়াহ্ -৭) মিসওয়াক (দাঁত ব্রাশ) গত দুইশ' বছরের কোন নতুন আবিষ্কার নয় বরং মহানবী ১৪০০ বছর পূর্বে দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে একে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার অনুসারীদের যদি কষ্ট না হতো তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করতে বলতাম।'

মেসওয়াক- পরিচ্ছন্নতার এক অপরিহার্য অঙ্গ যা আধুনিক যুগের টুথব্রাশ আবিষ্কারের উৎস

আল্লাহ বলেন,

"অবশ্যই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আল বাকারা : ২২২)

হাদিস

আবু মালেক আশরাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানে অংশ। (সহীহ মুসলিম) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পাঁচটি বিষয় স্বভাবজাত কাজের অন্তর্ভুক্ত : ১. খাতনা করা ২. গুপ্তস্থানের লোম কাটা ৩. নখ কাটা ৪. বগলের লোম উপড়ে ফেলা ৫. গোঁফ খাটো করা (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, দশটি কাজ সনাতন স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত : ১. গোঁফ খাটো করা ২. দাড়ি লম্বা করা ৩. মেছওয়াক করা ৪. পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা ৫. নখ কাটা ৬. আঙুলের গিরা সমূহ ধৌত করা ৭. বগলের লোম উপড়ে ফেলা ৮. গুপ্তস্থানে লোম কাটা ৯. পায়খানা প্রস্রাবের পর

ওজু- প্রতিদিন পাঁচবার ওজু ইসলামের পরিচ্ছন্নতা প্রিয়তার এক প্রকৃত নিদর্শন।

পানি ব্যবহার করা। বর্ণনাকরী বলেন, দশমটি ভুলে গিয়েছি, সম্ভবত ১০. কুলি করা। (সহীহ মুসলিম)
এমননিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবন থেকে আমরা অসংখ্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকা পাই, যা পালন করলে আধুনিক বিশ্বের শতকরা ৫০ ভাগ বা তদূর্ধ রোগের মাত্রা কমে যেত।

অসুস্থ হলে একজন মুসলমানের কী করা উচিত

১) প্রথমত, একে তার জীবনের ভুল এবং অপরাধের কাফফারা (বদলা) হিসেবে দেখা উচিত। যদি আল্লাহ তোমার কোন ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তাহলে তিনি সবকিছুর ওপরে শক্তিশালী। (সূরা আল আনয়াম : ১৭)
২) দ্বিতীয়ত, অনেক মুসলমানকে দেখা যায় যে, তারা অসুস্থতার প্রাথমিক পর্যায়কে গুরুত্ব দেয় না, যা মহানবী (সা) এর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।
উসামাহ বিন শারিক (রা) হতে বর্নিত, 'আমি মহানবীর সাথে ছিলাম। কিছু আরব এলো এবং জিজ্ঞাসা করল, 'হে রাসূল, আমরা কি অসুস্থতায় ঔষুধ গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ করবে কারণ আল্লাহ কোন রোগ তার প্রতিকার ব্যতীত সৃষ্টি করেননি একটি বাদে। তারা জিজ্ঞাসা করল কোনটি? তিনি বললেন বৃদ্ধাবস্থা।
৩। তৃতীয়ত, সুস্থতা এবং অসুস্থতা সম্পর্কে একটি সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। এটি শুধুমাত্র ডাক্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারে রোগ কী, কিভাবে এটি হয়, কিভাবে প্রতিকার করা যায়, কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়।
পরিশেষে আমাদের সুস্থ দেহ মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত বা উপহার হিসেবে একে অপব্যবহার করা উচিত নয়; উচিত নয় খারাপ বা মানহীন খাবার এই দেহরূপ মেশিনে দেয়া। বরং আমাদের উচিত এই দুর্বল এবং স্পর্শকাতর মেশিনের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা। তাহলেই আমরা আমদের জীবনকে উপভোগ করতে পারব।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআন।
২. আল হাদিস-বুখারী, মুসলিম।
৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন।
৪. ইন্টারনেট।

আত্মযাচাই

১. ঈমান কি স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে? কিভাবে?
২. স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাওমের ভূমিকা কী?
৩. কুরআন কোন কোন জিনিস খাওয়া হারাম করেছে?
৪. খাওয়ার সময় পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখা কেন প্রয়োজন?
৫. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত আয়াতগুলো কী কী?

লেখক :

ডাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন (আরিক)
arikssmc@gmail.com
arikssmc@yahoo.com

রাকিব আর তৌফিকের গল্প
বিজ্ঞানের আলোকে বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

এক.

ঢাকা মেডিক্যালের প্রথম বর্ষের ছাত্র রাকিব। সে এইচএসসি'তে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয় এবং মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা মেডিক্যাল ভর্তির সুযোগ পায়। রাকিবের বিজ্ঞানের প্রতি রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। তাই সে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। জ্যোতির্বিদ্যা ও জীববিজ্ঞানে তার আলাদা দুর্বলতা আছে। তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সে তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষ নিয়ে চিন্তা করে। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা তাকে ভাবায়।

তৌফিক রাকিবের খুব ভালো বন্ধু। সেও রাকিবের মত নটর ডেম কলেজে থেকে সর্বোচ্চ স্কোর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিকস বিভাগের ছাত্র। তৌফিক আর রাকিব দু'জনই সে সকল ছাত্রদের মতো নয়, যারা শুধু মাত্র পাস করার জন্যই পড়ে। বরং সে প্রতিটি বিষয় নিয়ে যুক্তিভিত্তিক চিন্তা করতে ভালোবাসে। তৌফিক আর রাকিবের মাঝে প্রায়ই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথোপকথন হয়। গত দিনের মতো আজকেও তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের পেছনে ন্যাসক্যাফে শপে এসেছে। শপ থেকে দু'জনে' দুটো কফি নিয়ে পরবর্তী বেঞ্চিটার নিকটে গেল।

"রাকিব একটা বিষয় ইদানীং আমাকে খুব চিন্তিত করে রেখেছে। কয়েকদিন ধরেই ব্যাপারটা বলব বলে ভাবছি। বলি বলি করে আর বলা হয়ে ওঠেনি।"

রাকিব ফুঁ দিয়ে বসার জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে বলল, " কোন বিষয়টা, দ্রুত বলে ফেল।"

বিষয়টা হলো মানুষের আদি উৎস। তোর কী মনে হয়? মানুষের আদি উৎস কী? বিজ্ঞানের বইগুলোতে মানুষের আদি উৎসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞানী চালর্স ডারইউন তার The Origin of Species বইয়ে প্রাণী জগতের উদ্ভব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অবতারণা করেন। বিবর্তনবাদ মতে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বানর জাতীয় মানুষ (Ape) থেকে পর্যায়ক্রমে মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে। আবার ধর্মতত্ত্বানুসারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই গঠন ও আকৃতি দিয়ে যে গঠন ও আকৃতি এখন দেখা যায়।" তৌফিক কফির কাপে চুমুক দিল। রাকিব বলল, "তাহলে প্রশ্নের অবতারণা হয় যে আমরা কোন তত্ত্বটিকে মেনে নেব। যদি বিবর্তনবাদ তত্ত্ব মেনে নেই তাহলে এটা মেনে নিতে হয় যে, মানুষ ও অন্যান্য জীব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে ধর্ম প্রস্তাবিত কথাগুলোকে অস্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। আবার যদি এটা মেনে নিই যে মানুষকে তার বর্তমান আকৃতিতেই সৃষ্টি করে পাঠানো হয়েছে তাহলে। বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করতে হয়। ঠিক এ প্রশ্নটাই আমার মাথায়ও এসেছিল। তাই আমি এ বিষয়ে কিছুটা পড়েছিও।

রাকিবকে একই বিষয়ে ভাবতে দেখে তৌফিক মনে মনে খুশি হল। সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু বিবর্তনতত্ত্ব কিভাবে সত্য হয়? বানর থেকে মানুষ আসার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানেই তো বোধগম্য হয় না!"

"ব্যাপারটা স্পষ্ট। বিবর্তনতত্ত্বটি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন কর্তৃক প্রস্তাবিত একটা ধারণা বা মতবাদ। কিন্তু এ মতবাদটি ডারউইনের বইয়ে যখন প্রথম অবতারণা হয় এরপর থেকে গত ১৫০ বছর যাবৎ তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তত্ত্বটি এখনও রয়ে গেছে। বরং অনুসন্ধানের ফলে এর বিপরীতে যত প্রমাণ বের হয়ে এসেছে তা এর পক্ষে উপস্থাপিত প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি। এরপরও পশ্চিমা বিজ্ঞানজগতের বিভিন্ন প্রকাশনা, ডকুমেন্টারি দেখলে মনে হয় বিবর্তনকে একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। এমনকি সমগ্র বিশ্বেই এটিকে স্কুল কলেজগুলোর পাঠ্যক্রমে একটি প্রমাণিত সত্য হিসেবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যদিও আমাদের দেশে সৌভাগ্যক্রমে সে পরিমাণটা খুবই সামান্য!" রাকিব তৌফিকের কথার জবাব দিল।

Finch পাখির ঠোঁট

ডারইউন এগুলোকে গালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জে দেখেছিলেন এবং তার তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে ধরেছিলেন। আসলে, পাখির ঠোঁটের এ বিভিন্নতার কারণ হল Genetic Variation কোন Macro evolution নয়।

"তাহলে বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বিবর্তন মতবাদটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে প্রতিটি জীবকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি জীব যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে বিজ্ঞান জগতে স্রষ্টায় অবিশ্বাসীর সংখ্যা এত বেশি কেন?" তৌফিক প্রশ্নের দৃষ্টিতে

তাকালো। "বিবর্তনবাদ মতবাদটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলেও বস্তুবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় এখনও এ মতবাদটিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রাখার ফলে এ সকল সমাজে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানীরা নাস্তিক হয়ে বড় হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনবাদ নিজেই একটি বিশ্বাসের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর সাথে বিজ্ঞানের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।" রাকিব কফিটা শেষ করতে করতে উত্তর করল।

তৌফিক হঠাৎ করে পাশের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে রাকিবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে তুই বলছিস এখানে বিশ্বাস বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে, বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান পরিমার্জিত হয়নি? বিজ্ঞানের ওপর অন্ধবিশ্বাসের জয় হয়েছে?' রাকিব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। সে তার হাতের কফির কাপটাকে মোচাতে মোচাতে বলল, "তবে সাধারণে এটা প্রচলিত যে ধর্ম শুধুমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার আর বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান। সুতরাং এখানে বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই আসে না। এ ধারণাটাকে পুঁজি করে যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা যায় তাহলেই বস্তুবাদীদের কার্যোদ্ধার হয়। আর সে কাজটাই করেছে প্রচারমাধ্যম। ফলে দেখা যায়, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানব ইতিহাস এমনকি অর্থনীতি রাজনীতিও বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত এবং এ সংক্রান্ত রচনা ও প্রবন্ধের বইগুলোতে বিবর্তনবাদকে প্রমাণিত সত্য ধরে নিয়ে লেখা হয়।"

তৌফিক কিছুটা অবাক হয়ে বলল, "বিবর্তনবাদ না হয় জীববিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি এমনকি রাজনীতিতে এর প্রভাবের ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছি না!"

" কেন তুই কী আমাদের মাধ্যমিক সমাজবিজ্ঞান বইয়ে পড়িসনি প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগের কথা। মানব ইতিহাসের এ পর্যায়গুলোতো বিবর্তনবাদী চিন্তাধারারই ফসল। এ সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। বিবর্তনবাদতত্ত্ব কী বলে? কিভাবে এটি প্রমাণ উপস্থাপন করে? কিভাবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে এটি ভুল প্রমাণিত হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে কী বলে?"

রাকিব আর তৌফিক দু'জনই বেঞ্চ থেকে উঠে দোয়েল চত্বরের দিতে হাঁটতে শুরু করে। রাকিব বলতে থাকে, "আমার পরিচিত এক বড় ভাই আছে। তার নাম রাজীব। সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তার এ ব্যাপারে ভাল পড়াশোনা করা আছে। মাঝে মধ্যেই তার সাথে আমার আলাপ হয়। চল আমরা একদিন তার কাছে যাই।"

"দোস্ত আগামীকালই যাওয়া যায় কি না দেখ? ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।"

"ঠিক আছে আমি আজ ফোন করে রাজীব ভাইয়ের কাছে থেকে সময় চেয়ে নেব।"

ফোনের কথা বলতে না বলতেই তৌফিকের মোবাইলে রিং বেজে উঠল। তৌফিক ফোনে কথা শেষ করে বলল, "রাকিব বাসা থেকে ফোন এসেছে। জরুরি কাজ আছে বাসায় ফিরতে হবে। আজ আসি।"

রাকিব আর তৌফিক সালাম বিনিময় করে বিদায় নিল। তৌফিক একটা রিকশা করে সেগুনবাগিচার দিকে গেল আর রাকিব শাহবাগের উদ্দেশে রওনা হল।

দুই.

আগামীকাল বিকেলে রাজীব ভাই সময় দিয়েছেন। তুই প্রস্তুতি নিয়ে আসিস। তৌফিককে ফোনে জানাল রাকিব। বিবর্তনবাদ যদি প্রমাণিত নাই হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক সমাজ কেন একে গ্রহণ করে আছে? বিবর্তনবাদ সমাজবিজ্ঞানে কিভাবে প্রভাব রাখল? প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ, ব্রোঞ্জযুগের সত্যতাটা কী? কিভাবে বিবর্তনবাদ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদগুলোকেও প্রভাবিত করল? এরকম নানা প্রশ্ন তৌফিকের মনে তৈরি হতে থাকে। পরদিন বিকেলে রাকিব তৌফিককে নিয়ে বকশিবাজার ডা. ফজলে রাব্বি হলে আসে। হলের গেটে রাজীব ভাই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গেটে সালাম বিনিময়ের পর রাজীব ভাই ওদের নিজের রুমে নিয়ে গেলেন। রাকিব এর আগেও এ হলে এসেছিল তার কাছে কোন কিছু নতুন নয়। অন্য দিকে তৌফিক এ হলের সাথে নিজের হলের পার্থক্য আর মিলগুলো খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। রাজিব ভাই যে রুমে থাকে সেটি গেট দিয়ে ঢুকতে দুই নম্বর বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়। রুম নং বি- ফোর। রাজীব ভাই বললেন, এ বিল্ডিংকে ব্লক বলে। কথোপকথনের শুরুতে রাজীব ভাই তৌফিকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জেনে নিলেন। এরপর তিনি তার শেল্‌ফ থেকে কয়েকটি বই বের করলেন। "বিবর্তনবাদকে বুঝতে হলে আমাদের জানা দরকার- বিজ্ঞানী ডারউইনের The Origin of Species- এ সম্পর্কে যে ধারণাটি পেশ করা হয়েছে তা কী? সেটি হল, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি বা অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। তার তত্ত্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো-

Stasis on the fossil Record

ফসিল রেকর্ডের স্থিরতা

যদি বিবর্তন সত্যিই হয়ে থাকতো তবে জীবজগৎ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হত এবং সময়ের ব্যবধানে এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে থাকার কথা। পক্ষান্তরে জীবাশ্ম রেকর্ড (fossil record) এর ঠিক বিপরীত অবস্থাই প্রদর্শন করে। জীবজগতের বিভিন্ন দলসমূহ (Groups) সমরূপী (similar) কোন পূর্বপুরুষ ব্যতিরেকেই হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই একই গঠনে স্থির হয়ে আছে।

A 100-150 million-year-old starfish fossil

Horseshoe crab" fossil from the ordovician Age. This 450- million-year-old fossil is no diffrent from specimens living today.

Oyster fossils from the Ordovician Age, no differet from modern oysters.
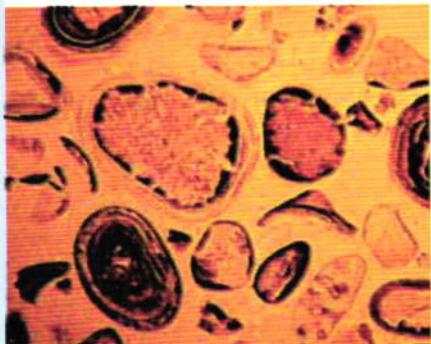
1.9 million-year-old fossil bacteria from western Ontario in the United States. They have the same Structures as bacteria living today.

Ammonites emerged some 350 million years ago, and became extinct 65 million years ago. the structure seen in the fossil above never chaged during the intervening 300 million years.

An insect fossil in amber, some 170 million years old, found on the Baltic Sea Coast. It is no differnt from its modern counterparts.

The oldest known fossil scropion, found in East Kirkton in Scotland. This Species, known as Pulmonoscorpius kirktoniensis, is 320 million years old, and no different from today's scorpions.

140-million-year-old dragonfly fossil found in Bavaria in Germany. It is identical to living dragonflies.
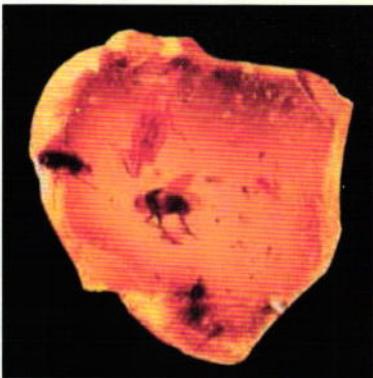
35 -million-year-old flies. They have the same bodily structure as flies today.

170-million-year-old fossil shrimp from the Jurassic Age. It is no different from living shrimps.

১. দৈবাৎ স্বয়ংক্রিয় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবের উৎপত্তি।
২. প্রাকৃতিক নির্বাচন।
৩. বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম।

আরেকটু বিস্তারিত বললে- প্রথমত, বিবর্তনবাদতত্ত্ব অনুসারে, জীবন্ত বস্তু অস্তিত্বে এসেছে দৈবাৎ কাকতালীয়ভাবে এবং পরবর্তীতে উন্নত হয়েছে আরও কিছু কাকতালীয় ঘটনার প্রভাবে। প্রায় ৩৮ বিলিয়ন বছর আগে, যখন পৃথিবীতে কোন জীবন্ত বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না, তখন প্রথম সরল এককোষী জীবের (আদিকোষ) উদ্ভব হয়। সময়ের পরিক্রমায় আরও জটিল এককোষী এবং বহুকোষী জীব অস্তিত্বে আসে। অন্য কথায় ডারউইনের তত্ত্বানুসারে প্রাকৃতিক শক্তি সরল প্রাণহীন উপাদানকে অত্যন্ত জটিল এবং খুঁতহীন পরিকল্পনাতে পরিণত করেছে! [১]

চার্লস্ ডারউইন

দ্বিতীয়ত, ডারউইনবাদের মূলে ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা।... প্রাকৃতিক নির্বাচন এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি সার্বক্ষণিক সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত যে, প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি সার্বক্ষণিক সংগ্রাম বিদ্যমান। এটা সে সকল জীবকে অগ্রাধিকার দেয় (Prefers) যাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ খাওয়ানো প্রজাতিটি বেঁচে থাকে। যে সকল হরিণ সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী তারাই শিকারি পশুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। অবশেষে হরিণের পালটিতে শুধু দ্রুতগামী হরিণগুলোই টিকে থাকবে।

(তবে যাই হোক যত সময় ধরেই উক্ত প্রক্রিয়াটি চলুক না কেন এটা সেই হরিণগুলোকে অন্য প্রজাতিতে পরিণত করবে না। দুর্বল দূরীভূত হবে, শক্তিশালী জয়ী হবে কিন্তু জেনেটিক ডাটাতে কোন পরিবর্তন সূচিত না হওয়ায় প্রজাতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না।)

হরিণের উদাহরণটি সকল প্রজাতির জন্যই সত্য। প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র যারা দুর্বল অথবা যারা প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না তাদেরকে দূরীভূত করে। এটা নতুন কোন প্রজাতি, কোন জেনেটিক তথ্য কিংবা কোন অঙ্গ তৈরি করে না। অর্থাৎ এটা কোন কিছুকে বিবর্তিত করতে সাহায্য করে না। ডারউইনও এই সত্যটাকে স্বীকার করেছিলেন এই বলে যে, ' প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না যদি অগ্রাধিকার যোগ্য স্বাতন্ত্র পার্থক্য ও বৈচিত্র্য না ঘটে'। [২]
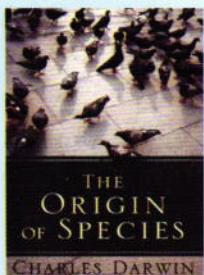
অরিজিন অব স্পিসিস

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের প্রয়োজনীয় ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি ভয়ানক সংগ্রাম চলছে এবং প্রতিটি জীব শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তা করে। ডারউইন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাসের মত (Idea) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ম্যালথাস মনে করতেন যে, মানবজাতিতে সন্দেহাতীতভাবে একটি সার্বক্ষণিক সংগ্রাম চলছে। তার চিন্তাভাবনার ভিত্তি ছিল এই যে, জনসংখ্যা এবং সেই সাথে খাদ্যের প্রয়োজন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, অন্যদিকে খাদ্যোর ভাণ্ডার বাড়ছে গাণিতিক হারে। এর ফলে জনসংখ্যার আকৃতি অপরিহার্যভাবে প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন ক্ষুধা ও রোগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ডারউইন মানবজাতিতে 'বাঁচার জন্য প্রচন্ড সংগ্রাম' সংক্রান্ত ম্যালথাসের দৃষ্টিভঙ্গিকে বড় আকারে একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন এবং বলে যে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এ লড়াইয়ের ফল।

যদিও পরবর্তীতে অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয়ে যে, প্রকৃতিতে জীবনের জন্য যে রকম কোন লড়াই সংঘটিত হচ্ছে না যেরূপ ডারউইন স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে একজন ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী ভি.সি. উইনে অ্যাডওয়ার্ডস এ উপসংহার টানেন যে, জীবজগৎ একটি কৌতুহলোদ্দীপক পন্থায় তাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করে। .... প্রাণীরা তাদের সংখ্যা কোনো প্রচন্ড প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয় বরং প্রজনন (reproduction) কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে করে।"

রাজীব ভাই এ পর্যন্ত বলার পর তৌফিক প্রশ্ন করল, 'বিবর্তনবাদ ধারণাটিকে বিজ্ঞানী চালর্স ডারউইনই কি প্রথম উপস্থাপন করেন?"

রাজীব ভাই তার ডায়েরিটা খুলে নোট করা কিছু লেখা তৌফিক ও রাকিবকে দেখালেন। তিনি বললেন,
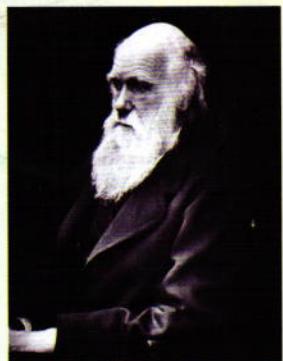
"প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। বরং বহু প্রাচীন কালেই এ তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল।" এবার তিনি তার কিছু নোট করা লেখা পড়তে পড়তে বললেন, তুর্কী দার্শনিক হারুন ইয়াহিয়া লেখেন-

"(বিবর্তনবাদের) ধারণাটি প্রাচীন গ্রিসের কতিপয় নাস্তিক বহুশ্বেরবাদী দার্শনিক প্রথম প্রস্তাব করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে সময়ের বিজ্ঞানীরা এমন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করত, যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ফলে এ সকল দার্শনিকদের ধারণা টিকতে পারেনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী চিন্তাধারার অগ্রগতির সাথে সাথে বিবর্তনবাদী চিন্তা পুনর্জীবন লাভ করে।[৪]

গ্রিক মাইলেশিয়ান দার্শনিকরা, যাদের কিনা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা কিংবা জীববিদ্যার কোন জ্ঞানই ছিল না, তারাই ডারউনবাদী চিন্তাধারার উৎস। থেলিস, অ্যানাক্সিম্যানডার, এমপোডোক্লেসদের মত দার্শনিকদের একটি মত ছিল জীবন্ত বস্তু প্রাণহীন বস্তু থেকে তথা বাতাস, আগুন এবং পানিয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এ তত্ত্ব মতে প্রথম জীবন্ত জিনিসটিও পানি থেকে হঠাৎ এবং স্বয়ংক্রি ভাবে তৈরি হয় এবং পরে কিছু জীব পানি থেকে মাটিতে উঠে এসে বাস করতে শুরু করে।[৫]

মাইলেশিয়ান গ্রিক দার্শনিক থেলিস (Thales) প্রথম স্বয়ং উৎপত্তিসংক্রান্ত ধারণার মত প্রকাশ করেন। অ্যাক্সিম্যানডার তার সময়কালের ঐতিহ্যগত ধারণা যে, জীবন কিছু সূর্যরশ্মির সাহায্যে 'Pre Biotic Soapo' থেকে উৎপন্ন হয়, তা উপস্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রথম প্রাণীটির উদ্ভব হয়েছে সূর্যরশ্মির দ্বারা বাষ্পীভূত সামুদ্রিক আঠালো কাদা মাটি (Seaslime) থেকে।

চার্লস ডারউইনের ধারণাও উক্ত বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডারউইনের প্রজাতির মধ্যে অস্তিত্বের লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচন ধারণাটির মূল নিহিত রয়েছে গ্রিক দর্শনে। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের থিসিস অনুযায়ী জীবজগতে সার্বক্ষণিক লড়াই সংঘটিত হচ্ছে।[৬]

আবার গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রস্তুতিতে ভূমিকা রাখেন, বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যেই বস্তুবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত তিনি তার ভিত রচনা করেন। তার মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছোট ছোট বস্তুকণা দ্বারা গঠিত এবং বস্তুছাড়া অন্য কিছুই অস্তিত্ব নেই। পরমাণু সবসময়ই বিরাজমান ছিল যা সৃষ্টি ও ধ্বংসহীন।[৭]

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল ও ডারউইনবাদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এরিস্টটলের মতে জীব প্রজাতিসমূহকে সরল থেকে জটিলের দিকে একটি হাইয়ারারকিতে সাজানো যায় এবং তাদেরকে মইয়ের মত একটি সরল রেখায় আনা (align) যায়। তিনি এ তত্ত্বটিকে বলেন Scala naturae. এরিস্টটলের এ ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের চিন্তাচেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং পরে তা 'The Great Chain of Being'- এ বিশ্বাসের উৎসে পরিণত হয়, পরবর্তীতে যেটা বিবর্তনবাদ তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়।

The Grteat Chain of Being একটি দার্শনিক ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ বিশ্বাস অনুসারে ছোট ছোট জীব ধাপে ধাপে বড় জীবে পরিণত হয়। এই Chain এ প্রতিটি জীবেরই একটি অবস্থান আছে। এ ধারণা অনুসারে পাথর, ধাতু, পানি এবং বাতাস ক্রমে কোন প্রকার বাধা ছাড়াই জীবন্ত বস্তুতে পরিণত হয়, তা থেকে হয় প্রাণী ও প্রাণী থেকে হয় মানবজাতি।... এতদিন ধরে এ বিশ্বাসটি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কারণটি বৈজ্ঞানিক নয়, বরং আদর্শিক।

The Great Chain of Being এর ধারণাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ পর্যন্ত বেশ বিখ্যাত ছিল এবং সে যুগের বস্তুবাদের ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। ফরাসি বিবর্তনবাদী (Comte de Bufon) কমটে ডি বুফন

বস্তুপূজারীদের মত ডারউইনবাদীরা বিশ্বাস করে যে দৈবাৎ পানির মধ্য থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এই অবোধগম্য দাবি অনুসারে ছবিতে প্রদর্শিত তথাকথিত 'primitive soap' থেকে কতগুলো জ্ঞানহীন পরমাণু একত্রিত হয় এবং জীবন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
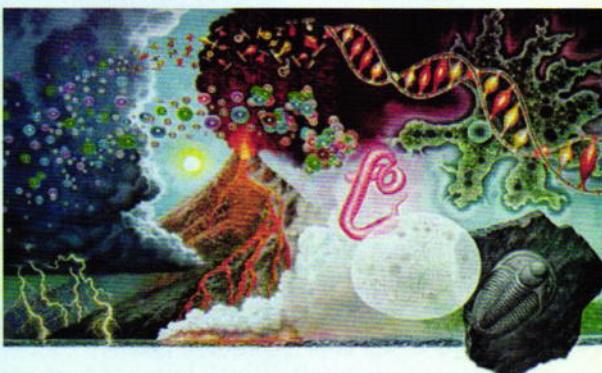
অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম বহুল পরিচিত বিজ্ঞানী ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় যাবৎ তিনি প্যারিসের রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক ছিলেন।
ডারউইন তার তত্ত্বের একটি বড় অংশ বুফনের কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। বিজ্ঞানী ডারউইনের (তত্ত্ব উপস্থাপন করতে) যে সকল উপাদান ব্যবহার করা দরকার ছিল তা (কমটে ডি বুফনের)

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করেন এবং একে ভুল প্রমাণিত করে তারা অনেক বই প্রকাশ করেছেন। উপরে এর অল্প কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

৪৪ খণ্ডে পুস্তক Historie Naturelle- তে পাওয়া যায়। ডি বুফন এবং লামার্ক দুজনেরই বিবর্তনসংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তি ছিল Great Chain of being এর ধারণা।
স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রাচীন গ্রিক উপকথা Great Chain of Being এর আধুনিক রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। ডারউইনের আগেও বিবর্তনবাদী ছিল এবং তাদের তথাকথিত ধারণা ও প্রমাণাদি Great Chain of Being এ পাওয়া যেত। ডি বুফন ও লামার্ক। Great Chain of Being কে বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন আকারে প্রকাশ করেন যা ডারউনকে প্রভাবিত করেছিল।
.... লরেন এইসল তার Darwin's Century বইয়ে উল্লেখ করেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্তিত্বের ক্রমবিকাশের ধারণাকে ডারউইন তার বই Origin of Species এ ব্যবহার করেন এবং এ ধারণাটিও সেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করে যে সমগ্র জৈব পদার্থ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" [৯]
রাজীব ভাই এ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন।
রাকিব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখছিলো। আসরের আজান হয়ে গেছে। ওরা বের হয়ে হলের মসজিদের দিকে এগুলো নামাজ আদায় করার জন্য। নামাজের পর রাজীব ভাই রাকিব আর তৌফিককে নাশতা করালেন। চা খেতে খেতে তৌফিক বলল, "রাজীব ভাই, আপনি এতক্ষণ যা বললেন তাতে বোঝা যায় যে বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা অনেক বছর ধরেই সমাজে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিল। আর এ ব্যাপারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানী লামার্কের বিশেষ অবদান ছিল।
"তুমি ঠিকই বলেছ, Harun Yahya লেখেন- বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মূল প্রাচীন গ্রিসে নিহিত হলেও এটিকে বিজ্ঞান জগতের মনোযোগের বিষয় পরিণত করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।
ফ্রেঞ্চ জীববিজানী জন ব্যাপটিস্ট লামার্ক তার Zoological Philosophy (১৮০৯) গ্রন্থে বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত সবচেয়ে বিস্তারিত দর্শন প্রকাশ করেন। লামার্ক ভেবেছিলেন যে, প্রতিটি জীবের মধ্যেই একটি জীবনী শক্তি (vital force) কাজ করে যেটি তাদেরকে জটিল গঠনের দিকে বিবর্তনের জন্য চালিত করে। তিনি এটাও ভেবেছিরেন যে, জীবেরা তাদের জীবনকালে অর্জিত গুণাবলি তাদের বংশধরে প্রবাহিত করতে পারে। এ ধরনের যুক্তি পেশ করার একটি উদাহরণ হল, লামার্ক প্রস্তাবনা করেছিলেন যে জিরাফের লম্বা ঘাড় বিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে তখন যখন তাদের পূর্ববর্তী কোন খাটো ঘাড়ের প্রজাতি ঘাসে খাবার খোঁজার পরিবর্তে গাছের পাতা খুঁজতে থাকে। কিন্তু লামার্কের এই বিবর্তনবাদী মডেল বংশানুক্রমিকতার জিনতত্ত্বীয় মডেল দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।
বিংশ শতাব্দীর মধ্যবতী সময়ে DNA এর গঠন আবিষ্কারের ফলে প্রকাশিত হয় যে, জীবিত বস্তুর কোষের নিউক্লিয়াস বিশেষ ধরনের জৈবিক সঙ্কেত ধারণ করে এবং এ তথ্য অন্য কোন অর্জিত গুণ দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য নয়। অন্য কথায় জিরাফের জীবনকালে জিরাফ যদি গাছের উপরের শাখাগুলোর দিকে ঘাড় লম্বা করতে গিয়ে তার ঘাড়কে কিছুটা লম্বা করে ফেলতে সক্ষম হয়ও তবুও তা তার বংশধরে পৌছাবে না। সংক্ষেপে লামার্কের তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে এবং তা একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণা হিসেবে ইতিহাসে রয়ে গেছে।" ১০
তৌফিকরা নাশতা শেষ করলে রাজীব ভাই আবার তাদের রুমে নিয়ে গেলেন। তৌফিক বলল, "আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব কিছু পর্যবেক্ষণের ওপর নির্মিত একটি দর্শন বা তত্ত্ব, যা কিনা গ্রিক দার্শনিকরা প্রথম প্রস্তাব করে এবং ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী চার্লস

ডারউইনের হাতে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপ লাভ করে।"

"কিন্তু রাজীব ভাই সকল জীব প্রজাতিকে যদি সরল থেকে ক্রমান্বয়ে জটিলের দিকে সাজানোই যায়, তাহলে এ সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, জীব প্রজাতি ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।" রাকিব প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে রাজীব ভাইয়ের দিকে তাকালো। রাজীব ভাই বললেন, "ঠিক! এমনকি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতবাদের কট্টর সমর্থক ও প্রচারক Earnest Hackel এ সংক্রান্ত একটি স্কেচও করেন, যা Tree of life নামে অভিহিত। তোমরা হয়তো উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান বইয়ে এটি দেখে থাকবে। তৌফিক প্রশ্ন করল, Tree of life টা কী?" রাজীব ভাই বললেন, " এ বিষয়টি জানার আগে আমাদের জানা থাকা দরকার, তোমরা হয়তো already জেনেও থাকবে যে, সমগ্র জীবজগৎকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

Tree of life:
বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী
Earnst Heckel কর্তৃক অঙ্কিত 'Tree of life'.

এভাবে ক্রমান্বয়ে জীবজগতে একটি জীবের শ্রেণীবিন্যাসগত যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে থাকে-

জগৎ (Kingdom)
পর্ব (Phylum; plural Phyla)
শ্রেণী (Class)
বর্গ (Order)
গোত্র (familly)
ঘন (Genus)
প্রজাতি (Species)

আমরা জানি, সমগ্র জীবজগৎকে মোটামুটি ৫টি জগতে ভাগ করা যায়। এরা হলো প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, ছত্রাক, প্রোটিস্টা এবং মনেরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হলো প্রাণীজগৎ।

প্রাণীজগতের মধ্যে ৩৫টির মত পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে Protozoa, Nedophora, Platehelminthes, Nematdda, Mollusca, Arthropoda, Chordata সম্বন্ধে আমরা পড়েছি কিন্তু আমরা এও জানি যদিও প্রজাতিগুলোর কতগুলো সমবৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে বিভিন্ন পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তথাপি প্রতিটি প্রজাতিই স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে এই বিষয়গুলো আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন Chordata পর্বের Mammalia উপপর্বের দু'টি প্রজাতি হলো বানর ও বেবুন। যদিও এরা দেখতে প্রায় একই রকম কিন্তু এদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র পার্থক্য আছে।" তৌফিক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "যদি প্রজাতিগুলোর মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সত্যিই সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে তো দু'টি কাছাকাছি প্রজাতির মধ্যে একটি অবস্থান্তরবর্তী (Transitional) প্রজাতি থাকার কথা। বিবর্তনবাদীরা যেমন বলে যে মাছ থেকে সরীসৃপ হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাছ ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী প্রজাতি থাকার কথা।" রাজীব ভাই বললেন, "তাহলে প্রশ্ন হয় যে বর্তমানে এ ধরনের প্রজাতি নেই কেন? ডারউইন বলেন, প্রাকৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে উন্নত প্রজাতি বাছাই হয়ে গেলে পড়ে বিবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সে প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে জীবাশ্মের মধ্যে সেই অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির সন্ধান পাওয়ার কথা। এ ব্যাপারটি ডারউইন নিজেও অনুভব করেছিলেন। তার বইয়ের Difficulties of the Theory অধ্যায়ে তিনি নিজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন এভাবে, "কিন্তু যদিও এ তত্ত্বানুসারে অসংখ্য মধ্যবর্তী রূপ (Tansitional form) থাকার কথা তথাপি আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে তাদের অগণিত সংখ্যায় প্রোথিত পাচ্ছি না কেন?" [১১]

ডারউইন তার উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন যে জীবাশ্ম রেকর্ড খুবই অসম্পূর্ণ। কিন্তু ডারউইন এ তত্ত্ব দেয়ার পর গত ১৫০ বছর যাবৎ মিলিয়ন মিলিয়ন জীবাশ্ম উদ্ধার রেকর্ড করা হয়েছে। জীবাশ্ম রেকর্ড এখন প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু এখনও ডারউইনের এ প্রশ্নের কোন সমাধান হয়নি। এ ব্যাপারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্মা বিদ্যায় পারদর্শী একজন একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী Robert Carrol স্বীকার করেন যে, ফসিলের আবিষ্কার ডারউইনের আশাকে পূর্ণ করতে পারেনি:

"ডারউইনের মৃত্যুর পর একশত বছরের ব্যাপক সংগ্রহ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসংখ্য মধ্যবর্তী সংযোজনকারী প্রজাতির যে চিত্র আশা করা হচ্ছিল তা দেখা যাচ্ছে না।" [১২]

বিবর্তনবাদীদের এ ধরনের মন্তব্য থেকে লক্ষণীয় যে, তারা সুস্পষ্টভাবে তাদের তত্ত্বের ভিত্তি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাসী হয়ে আছে। আর হ্যাঁ, Tree of life এর concept. এ সম্পর্কে হারুণ ইয়াহিয়া লেখেন, Tree of life এর ধারণা অনুসারে পর্বসমূহ (Phyla) পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে আবির্ভূত (Emerge) হয়েছে। ডারউইনবাদ অনুসারে, প্রথমে একটি পর্বকে অবশ্যই আবির্ভূত হতে হবে এবং তারপর অন্য পর্বসমূহ ব্যাপক সময়ের ব্যবধানে অল্প অল্প করে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হতে থাকবে। এই চিত্রটিতে ডারউইনবাদীদের চোখে- প্রাণীর পর্বের সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে। (এই বলে রাজীব ভাই তার নোটে সংগ্রহ করা পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখালেন।) বিবর্তনবাদ অনুসারে জীবন এভাবেই Develop হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? নিশ্চয়ই না। বরঞ্চ বিপরীতপক্ষে, প্রাণীরা তাদের আবির্ভাবকাল থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক ও জটিল গঠনের অধিকারী ছিল। বর্তমানে জ্ঞাত সকল প্রাণী পর্বসমূহ (Animal Phyla) geilogical period এর ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়। এ সময়টিকে বলা হয় Cambrian age. Cambrian Age হলো ৬৫ মিলিয়ন বছর দীর্ঘ একটি geological period যা কিনা প্রায় ৫৭০ থেকে ৫০৫ মিলিয়ন বছর আগে বর্তমান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণী পর্বসমূহের হঠাৎ আবির্ভাবকে Cambrian এর আরও ক্ষুদ্র সময়ের একটি দশায় স্থাপন করা যায়, যা কিনা Cambrian explosion নামে অভিহিত।.... এ সময়ের আগে, এককোষী জীব ও কিছু আদিম (Primitive) বহুকোষী জীব ছাড়া কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায় না। সকল প্রাণী পর্বসমূহ (Animal Phyla) সম্পূর্ণ সুগঠিতভাবে একই সঙ্গে আবির্ভূত হয় একটি খুবই ক্ষুদ্র সময়ে, যেটা Cambrian explosion নামে অভিহিত।"[১৩]

রাকিব রাজীব ভাইয়ের সাথে সংযুক্ত করল, "ডারউইন প্রাণীর সঙ্করায়নের ওপর পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, এ প্রক্রিয়ায় অধিক উৎপাদনশীল প্রাণী (যেমন অধিক উৎপাদনশীল গরু) উৎপন্ন হচ্ছে। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বলেন যে, এভাবে ক্রমাগত একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতেই কোন প্রজাতিতে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। কিন্তু তাতে যত পরিবতন হোক গরু তো গরুই থাকছে। এটাই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুর রহীম তার বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব বইয়ে লিখেছেন : 'জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধিজনিত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দৈহিক আঙ্গিকতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় রূপ। ডারউইনের বিশেষ মতদার্শের প্রাসাদ এর-ই ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বংশবৃদ্ধি তত্ত্বে পারদর্শী লোকেরা ঘোড়া, গরু, মেষ, হাঁস-মুরগির বিভিন্ন বিশেষত্ব সম্পন্ন বহু উত্তম ও উন্নতমানের বংশ উদ্ভাবন করে থাকেন। এ বিশেষত্বসমূহ বংশানুক্রমিক হয়। মুরগির বংশবৃদ্ধি তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। বেশি বেশি ডিম দানে সক্ষম কিংবা বেশি হৃষ্টপুষ্ট মুরগি অধিক গোশতসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম হয়। এ থেকে ডারউইন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন যে, লালন পালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করে অধিক উন্নতমানের বংশ উদ্ভাবন করা সম্ভব। আর এ বিশেষত্ব বংশানুক্রমিকতার সাহায্যে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।

এ কথা অনেকটা সত্য এবং অনস্বীকার্য, কিন্তু তা যতটা পর্যবেক্ষণে আসে ততটাই, তার বেশি নয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্ন জীববংশে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধান এবং তা অধস্তন বংশে সংক্রমণ করাই ছিল আসল লক্ষ্য। তার কার্যক্রম ও পদ্ধতি কী হতে পারে তাই ছিল প্রশ্ন। কিন্তু যে প্রাণীগুলোর মধ্যে আদৌ কোন বিশেষত্ব নেই সেগুলোকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

এ জন্য কেবলমাত্র বাছাইকরা ও উন্নতমানের বংশকেই গ্রহণ করা হয়েছে। খারাপ ও অনুন্নতমানের বংশ নিয়ে কখনও এ প্রচেষ্টা চালানো হয়নি নিতান্ত নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রম মনে করে। এ জন্য বংশানুক্রমিকতার বিধান ও খাদ্যের বিশেষ অধ্যয়ন চলছে। কিন্তু এসবের মূলে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ মৌলিক ও আঙ্গিক পরিবর্তন সাধন কখনও লক্ষ্য ছিল না। আঙ্গিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কখনই এরূপ করা হয়নি।

অবস্থিত মৌলিক বিশেষত্বে উন্নতি বিধান ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যেই এ সব করা হয়েছে। কিন্তু বংশবৃদ্ধি তত্ত্বে পারদর্শীদের এসব অভিজ্ঞতাকে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামো পরিবর্তন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চিন্তা কেবলমাত্র ডারউইনের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং তাকে বংশানুক্রমিক বলে তার মতাদর্শের ওপর ভিত্তি উপস্থাপন করা তার-ই অভিনব ও হাস্যকর বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ চেষ্টালব্ধ বিশেষত্ব চিরকালই ক্ষণস্থায়ী, তা কখনো বংশানুক্রমিক হয় না।

কিন্তু উত্তরাধিকার বিধান সম্পর্কে ডারউইন চরমভাবে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। মেন্ডেলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার জ্ঞান বহির্ভূত। নিছক চিন্তাবিলাস ও আকাশ কুসুম কল্পনাই তার একমাত্র মূলধন। যে জিনিসকে তিনি বংশানুক্রমিক বলে অভিহিত করেছেন, তা যে আদৌ বংশানুক্রমকি নয় তাও তার অজানা।

The fossil record denies the theory of evolution

ফসিল রেকর্ড (জীবাশ্ম রেকর্ড) বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে।
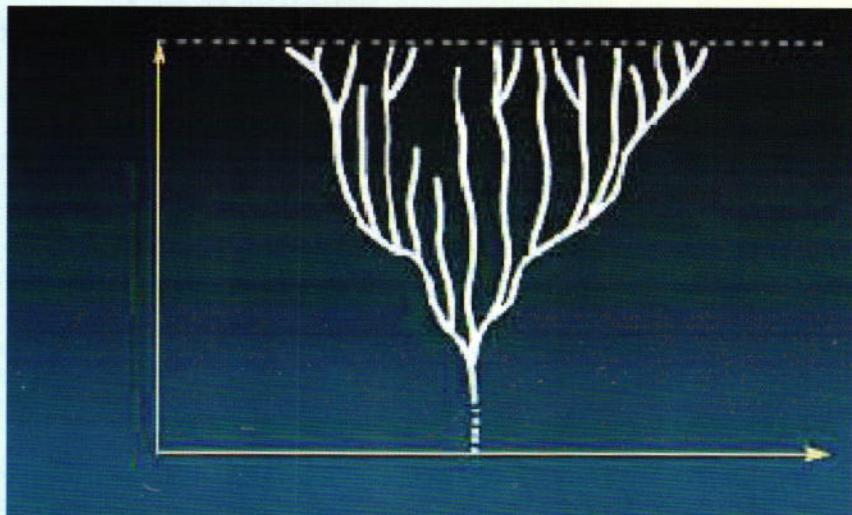
NATURAL HISTORY ACCORDIG TO THE THEORY OF EVOLUTION
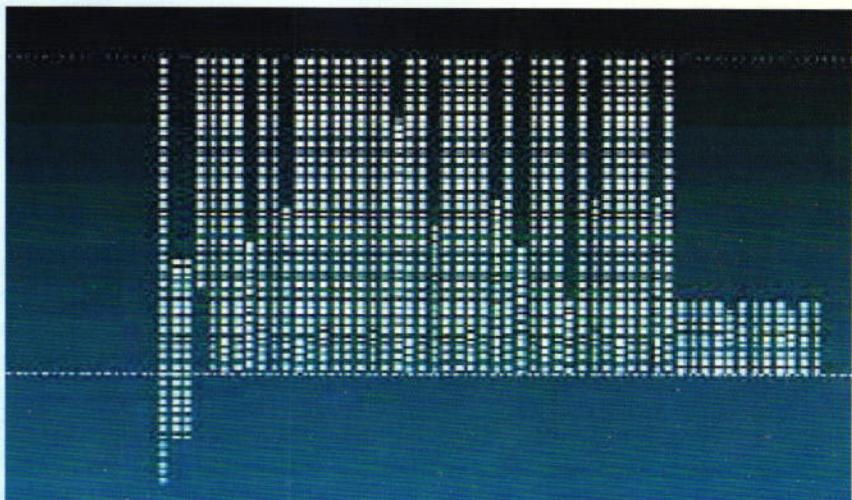
TURE HISTORY AS REVEALED BY THE FOSSIL RECORD

বিবর্তনবাদ বলে জীবজগতের বিভিন্ন দলসমূহ একই পূর্ব পুরুষ (প্রজাতি) থেকে এসেছে এবং সময়ের পরিক্রমায় পৃথক হয়ে গেছে। উপরের ছবিটি এই দাবিটি উপস্থাপন করে। ডারউইনবাদীদের মতে জীবসমূহ পরস্পর থেকে গাছের শাখা প্রশাখার মত পৃথক হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ফসিল রেকর্ড তার বিপরীত অবস্থাই প্রদর্শন করে । নিচের চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগতের বিভিন্ন দলসমূহ তথা পর্বসমূহ হঠাৎ তাদের বিভিন্ন গঠনসহ আবির্ভূত হয়।Cambrian age এ ১০০ টির মত পর্ব হঠাৎ উত্থিত (Emerge) হয়। পরবর্তীতে সংখ্যাটা না বেড়ে কমতে থাকে। কেননা কিছু পর্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। (From www. arn. org)

উইলিয়াম বেক লিখেছেন : 'জীবজন্তুর বংশে কোন- কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য সূচিত হতে থাকে প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের ভিত্তি। ডারউইন মেন্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তার গ্রন্থ অরিজিন অব স্পিসিজ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, উপার্জিত পরিবর্তনসমূহ বংশানুক্রমিক হবে- এ কল্পনাকে বাস্তব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ডারউইন দৈহিক পরিবর্তনসমূহকে খুব ভয়ে ভয়ে ও সঙ্কোচসিদ্ধ পেঁচানো পন্থায় পেশ করেছেন' [Modern Science and the Nature of life, P. 224] । কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেন্ডেলের গবেষণা ফল যখন আত্মপ্রকাশ করল এবং তিনি যখন বংশানুক্রমিকতার বিধান ব্যাখ্যা করলেন তখন ডারউইনের কল্পনার ভিত্তিহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। আর চেষ্টা সাধনা ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামলব্ধ উপার্জিত বিশেষত্ব যে বংশানুক্রমিক হয় না তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না।

বস্তুত জীবদেহের প্রতিটি কোষে এক বিশেষ ধরনের জীবাণু থাকে। তার নাম ক্রোমাসোম। প্রত্যেক প্রজাতির জীবের জন্য ক্রোমোসমের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন। মানবদেহের প্রতিটি কোষে তেইশ জোড়া (৪৬টি) ক্রোমোসোম থাকে। ইউরোপের উন্নতমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ মানুষ কিংবা আফ্রিকার বৃহদাকার আরণ্যিক অথবা পিতবর্ণের চৈনিক বা রেড ইন্ডিয়ান যেই হোক, সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা সমানভাবে সত্য। আর এ ক্রোমোসোমই হয় উত্তরাধিকারমূলক গুণের ধারক। তা-ই হয় জীবন স্থির রাখার নিরামক।

গর্ভধারণের মাধ্যমে জীবন সংক্রমণের জন্যও তাই দায়ী। গ্রেগর মেন্ডেলের আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালের গবেষণায় এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আসলে প্রতিটি ক্রোমোসোমে থাকে জিন, যা বংশগতির তথ্য ধারণ করে রাখে। জিনের মধ্যে কোন পরিবর্তন না হলে কোন জীবের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনটাই পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়।"[১৪]

রাকিব তার সাথে নিয়ে আসা ডায়েরি থেকে কথাগুলো পড়ে শোনাল। তৌফিক যোগ করল- আর ডারউইনের সময়ে যে অনুন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল তাতে প্রতিটি কোষকে একটি প্রকোষ্ঠ ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে একটি সাধারণ কোষের গঠন যে কত জটিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন পদার্থ থেকে কোষের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্টতই অযৌক্তিক।

তৌফিকের কথা শেষ হতে হতে মাগরিবের আজান পড়ে গেল। নামাজ আদায়ের পর রাজীব ভাই তৌফিক ও রাকিবের সাথে ঠিক করলেন আজকের মতো এখানেই তাদের আলোচনা সমাপ্ত। তবে আগামী শুক্রবার তারা আবার বসুন্ধরা সিটির আট তলায় মিলিত হবেন।

তিন.

শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় বসুন্ধরা সিটির নিচে পানির ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে রাজীব ভাই অপেক্ষা করছিলেন রাকিব ও তৌফিকের জন্য। বাদ আসর তাদের মিলিত হওয়ার কথা। রাজীব ভাই আজকে তার সাথে তার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন। নাম কায়ছার। কায়ছার ভাই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল সেমিস্টারে আছেন। কিছুক্ষণ পরই রাকিব ও তৌফিক পূর্ব দিক হতে এসে রাজীব ভাইয়ের সাথে মিলিত হলে তারা কায়ছার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিল। লেভেল এইটে ওঠার জন্য তারা এলিভেটরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "বসুন্ধরা সিটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শপিং কমপ্লেক্স। এত বড় লাক্সারিয়াস মার্কেট বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। আবার এ ধরনের একটি শপিং কমপ্লেক্স বাংলাদেশে হওয়াটাও একটা বিশাল ব্যাপার, প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু। যাই হোক, একটা বিষয়কে কত দিক থেকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো যায়। লজিক আর এন্টি-লজিক সবসময় সমান তালে চলে। কিন্তু সঠিক যুক্তিগুলো তো সত্যের ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। যেমন নিউটোনিয়ান বলের সূত্র একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কেউ যদি বলে, 'আমাদের ওজনের সমপরিমাণ বিপরীত বল আমাদের ওপর ক্রিয়া করার ফলেই আমরা কোন তলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি' তাহলে কোয়ান্টাম ফিসিক্সের জগৎ ছাড়া বাকি সবক্ষেত্রে তার কথাটি ঠিক এবং এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এর বিপরীতে অনেক যুক্তি দেয়া হলেও তা সুযুক্তি হবে না।" রাকিব কথাগুলো মনে মনে ভাবছিল। এলিভেটর নিচে চলে এসেছে। ভেতর থেকে বিভিন্ন রঙ ও ঢঙের মানুষ বের হয়ে এল। রাকিবরা ভেতরে প্রবেশ করল। তাদের গন্তব্য লেভেল ৮। এলিভেটরের কাছের দেয়াল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাকিব দেখল হঠাৎ করে মাথায় একটা চাপ অনুভূত হয়ে এলিভেটরের ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। নিচের জগৎটা ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। লেবেল ৮- এ পৌঁছে রাজীব ভাই সবাইকে নিয়ে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের কাছে গিয়ে বসলেন। সবার আগে কায়ছার ভাই মুখ খুললেন।

"আসলে বুয়েটে প্রথম বর্ষে পড়াকালীন আমি নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলাম। আমার অন্য কয়েকজন বন্ধুর

মতো আমারও কিছু বইয়ের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। মানুষের আদি উৎসের ব্যাপারে আমারও বিবর্তনবাদেই বিশ্বাস ছিল। আমার মনে হতো বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তত্ত্ব। ফলে আমিও মনে করতাম পৃথিবীর আদি প্রকৃতিতে একদিন হঠাৎ দুর্ঘটনাক্রমে আদি কোষ তৈরি হয়। আগে ধর্মসমূহকে মানুষের তৈরি মনে হতো, পরে আমার এক বন্ধুর দেয়া কিছু বই পড়ে আমার চিন্তার বন্ধ দ্বার খুলে যায়। আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, বিশ্বজগতের এই বিশাল জটিল ও অসাধারণ উপাদানসমূহ কোন দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়নি। বরং একজন সুবিদিত সত্তা এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তখন আমি নিজের ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধেও জানার চেষ্টা করলাম। আমার কাছে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। বরং আমাদের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য প্রতি যুগেই কিছু সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে তিনি নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছিলেন। আর এটাও বুঝতে সক্ষম হই মানুষ পরবর্তীতে আল্লাহর দেয়া বিধানকে পরিবর্তন করে নিজেদের অধীন বানিয়ে নিয়েছে। সে যাই হোক, আমি রাজীবের কাছ থেকে তোমাদের আলোচনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। খুবই ভালো। সৃষ্টি কি দুর্ঘটনা? এ ব্যাপারে তাফহিমুল কুরআনে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) লেখেন- "প্রথমে সৃষ্টিকর্তা নিজের প্রত্যেক সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেই মানুষের বংশ বিস্তারে এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তার শুক্র থেকে তারই মত মানুষের জন্ম হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভূমির সারবস্তু একত্র করে একটি নির্দেশের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন জীবন চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করে দেন যার মাধ্যমে মানুষের মত একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এটি ছিল একটি কর্মকুশলতা। আবার দ্বিতীয় কর্মকুশলতা হচ্ছে আগামীতে আরো মানুষ তৈরি করার জন্য এমন একটি অদ্ভুত কাঠামো মানুষের নিজের কাঠামোতেই রেখে দেন। যার গঠন প্রকৃতি ও কার্যধারা দেখে মানবীয় বিবেকবুদ্ধি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়।

ডারউইনের যুগের বিজ্ঞানীগণ এ চিন্তাধারার ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চন করে আসছেন এবং ডারউইনবাদকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ গণ্য করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে একে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষের ও জীবের সমস্ত প্রজাতির না হোক অন্ততপক্ষে সর্বপ্রথম জীবনকোষের সরাসরি সৃষ্টি থেকে তো তারা নিজেদের চিন্তাকেই মুক্ত করতে পারবে না। এ সৃষ্টিকে মেনে না নিলে এ ধরনের একদম বাজে কথা মেনে নিতে হবে যে, জীবনের সূচনা হয় নিছক একটা দুর্ঘটনাক্রমে অথচ শুধুমাত্র এককোষসম্পন্ন জীবের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে সহজ অবস্থাও এতটা জটিল ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারুকাজে পরিপূর্ণ যাকে একটি দুর্ঘটনার ফল বলে গণ্য করা একেবারেই অযৌক্তিক। এটা ক্রমবিবর্তন মতবাদের প্রবক্তারা 'সৃষ্টি মতবাদ'কে যতটা অবৈজ্ঞানিক মনে করেন তার চেয়ে লাখো গুণ বেশি অবৈজ্ঞানিক। আর মানুষ যদি একবার এ কথা মেনে নেয় যে, জীবের প্রত্যেক প্রজাতির প্রথমজন স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর তার বংশধারা প্রজনন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে চলে আসছে। একথা মেনে নেয়ার ফলে এমন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, ডারউইনের পতাকাবাহীদের সকল বৈজ্ঞানিক কাব্যচর্চা সত্ত্বেও তাদের ক্রমবিবর্তনবাদী মতবাদের যেগুলোর কোন সমাধান হয়নি।"[১৫]

রাজীব ভাই বললেন, "আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা দ্বারা এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জীবনকে যেরূপ সরল মনে করা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সেটি তার চেয়ে বহুগুণে জটিল। এতে অসংখ্য জটিল অণু বিদ্যমান। আমরা জানি, কোষে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট (শর্করা), প্রোটিন (আমিষ), লিপিড (চর্বি), ভিটামিন ও মিনারেল এবং পানি দিয়ে গঠিত। এ ছাড়া কোষে প্রতিনিয়ত অনেক পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ আণবিক প্রক্রিয়া সর্বদা সংঘটিত হচ্ছে। মাইকেল ভেন্টর তার Evolution: A Theory in Crisis গ্রন্থে লেখেন: 'আণবিক জীববিদ্যা জীবনের যে বাস্তবতা প্রকাশ করেছে সেটি অনুধাবন করতে হলে, আমাদের একটি কোষকে শতকোটি গুণ বড় করে দেখতে হবে যতক্ষণ না তা এত বড় করে দেখা হয় যে, তা ২০ কিলোমিটার ব্যাস ধারণ করে এবং গোটা লন্ডন বা নিউইয়র্ক শহরকে ঢেকে দেয়ার মত বিশাল উড়োজাহাজের অনুরূপ আকৃতি লাভ করে। আমরা তখন যা দেখতে পাব তা হলো, একটি উপযুক্ত নকশা ও অসমান্তরাল জটিলতার বস্তু। উপরিতলে আমরা দেখতে পাব একটি বিশাল মহাকাশ যানে আলো বাতাস ঢোকার জন্য যে ছিদ্র রাখা হয় তার মত লক্ষ লক্ষ ছিদ্র যেগুলো অনবরত খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে এবং কোষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ভেতরে ঢোকানোর ও বাইরে বের করে দেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমরা যদি রন্ধ্রগুলোর একটিতে ঢুকতে চাইতাম তাহলে আমরা আমাদেরকে এক সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি ও বিস্ময়কর জটিলতার জগতে দেখতে পেতাম-এটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য যে এলোপাতাড়ি কতগুলো প্রক্রিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ক্ষুদ্রতম উপাদানটিও (যেমন প্রোটিন বা জিন) এতটাই জটিল যা আমাদের নিজেদের সৃষ্টিশীল যোগ্যতার বাইরে? বরং (এই জটিলতাটাই) এমন একটি বাস্তবতা, যা 'দৈবাৎ সৃষ্টি' হওয়ার মতবাদের বিপরীত তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং যেটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তৈরি যে কোন জিনিসের জটিলতাকে ছাড়িয়ে যায়।[১৬]

ইংলিশ জোতির্বিদ এবং গাণিতিক স্যার ফ্রেড হোয়েল একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও বলেন যে, '(একটি) উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গঠন অকস্মাৎ তৈরি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা এর সাথে তুলনীয় যে, একটি টর্নেডো কোন লোহা-লক্করের স্তূপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান প্রস্তুত হয়ে গেল।[১৭] অন্যদিকে বিবর্তনবাদীরা একটি কোষ তো দূরে থাক বরং কোষের গাঠনিক উপাদান যেমন একটি প্রোটিনের উৎপত্তি পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। প্রোটিনের গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিড। সবচেয়ে সরলতম প্রোটিনটিও ৫০টি অ্যামাইনো এসিডের সমন্বয়ে গঠিত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, কোন প্রোটিনে একটি অ্যামাইনো এসিডও যদি যোগ বা বিয়োগ অথবা পরিবর্তন করা হয় তবে প্রোটিনা টি একটি অব্যবহার্য অণু স্থূপে পরিণত হয়। (এমনকি বিবর্তন তত্ত্ব একটি অ্যামাইনো এসিড তৈরির ঘটনারও ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।)

প্রোটিনের কার্যকরী গঠন যে অকস্মাৎ দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব তা একটি সরল সম্ভাব্যতার গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমেই দেখানো যায়। যেমন (ধরি) একটি মধ্যম আকৃতির প্রোটিন অনু যেখানে ২৮৮টি অ্যামাইনো এসিড আছে। সুতরাং ২৮৮টি স্থানে ১২টি বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো এসিডকে যেভাবে সাজানো যায় তার সংখ্যাটা হলো $১০^{৩০০}$ (এটি একটি অনেক বড় সংখ্যা এখানে ১ এর পর ৩০০টি শূন্য বসবে) এই সবগুলো সম্ভাব্য অনুক্রমের (Sequence), মধ্যে কেবলমাত্র একটিই প্রত্যাশিত প্রোটিন অণুটিকে গঠন করতে পারে। অন্য সকল অনুক্রমগুলো হয় অর্থহীন অ্যামাইনো এসিডের চেইন গঠন করে নতুবা প্রস্তুত করে জীবনের জন্য কোন ক্ষতিকর প্রোটিন।

অন্য কথায়, একটা প্রোটিন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা $১০^{৩০০}$ এর মধ্যে মাত্র ১ বার! অন্যকথার সম্ভাবনা ০। ব্যবহারিকভাবে, $১০^{৫০}$ এর মধ্যে ১ এর ছোট যে কোন সম্ভাব্যতাকে শূন্য সম্ভাবনা ধরা হয়।[১৮]
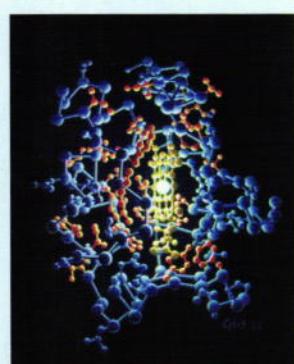
সাইটোক্রম সি প্রোটিনের জটিল ত্রিমাত্রিক গঠন। ছোট ছোট বলগুলো অ্যামাইনো এসিডকে বুঝাচ্ছে। এই অ্যামাইনো এসিডের ক্রম ও আপেক্ষিক অবস্থানে ন্যূনতম ব্যত্যয় ঘটলে পুরো প্রোটিনটিই অকার্যকর হয়ে যাবে। অথচ বিবর্তনবাদীদের ধারণা এ ধরনের অসংখ্য প্রোটিন নাকি কোনো প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই দৈবাৎ দূর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে।

অথচ একটি কোষে শুধুমাত্র প্রোটিন-ই থাকে না, থাকে নিউক্লিয়িক এসিড, শর্করা, লিপিড, ভিটামিন এবং আরো অনেক রাসায়নিক দ্রব্য যেমন আয়নসমূহ যা গাঠনিক ও কার্যকরী দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিকল্পিতভাবে ভারসাম্যতা বজায় রেখে অবস্থান করে। ... নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রবার্ট শাকিরো একটি ব্যাকটেরিয়াতে প্রাপ্য ২০০০ প্রোটিনের কাকতালীয়ভাবে একইসঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা হিসাব করেন। তিনি যে সংখ্যাটি পান তা হল $১০^{৪০০০০}$ এর ভেতর ১ বার! (অবিশ্বাস্য, তাই না? অনুরূপ একজন মানুষের একটি কোষেও ২০০০টি বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন থাকে।)

ওয়েল্‌স ইউনিভার্সিটির কলেজ কার্ডিফের প্রায়োগিক গণিত ও জোতির্বিদ্যার অধ্যাপক চন্দ্র বিক্রমাসিংহে মন্তব্য করেন: জীবনের প্রাণহীন বস্তু থেকে তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হলো ১ এর পরে ৪০০০০ শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয় তার মধ্যে ১। ... এটা এমন বড় একটা সংখ্যা যা ডারউইন ও তার বিবর্তন তত্ত্বকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট। না পৃথিবীতে কোন আদি অর্গানিক সুপ ছিল না অন্য কোথাও। এবং যদি জীবনের শুরু দৈবাৎ না হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তৈরি হয়ে থাকবে।

[Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe; Evolution from space; Sinor & schuter. New York. 1984, p. 148]

স্যার ফ্রেড হয়েল এতই কার্যত অযৌক্তিক সংখ্যার ব্যাপারে এভাবে মন্তব্য করেন :

'বস্তুত (একজন বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারা জীবন প্রস্তুত হওয়ার) তত্ত্বটি এতটাই সুস্পষ্ট যে, একজন অবাক হয় যে কেন এটি স্বতঃপ্রমাণিত হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে না?

(আসলে) এর এটি গ্রহণ না করার পেছনের কারণটি বৈজ্ঞানিক নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক।[১৯]

আবার প্রোটিন তৈরির জন্য সঠিক অ্যামাইনো এসিডগুলো উপযুক্ত ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়াই শুধু যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে অ্যামাইনো এসিডগুলোকে বাঁহাতি গঠনের হতে হবে। আমরা জানি, অন্য জৈব অণুর

মতোই দু'টি ভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো এসিড আছে, ডানহাতি এবং বাঁহাতি। এদের পার্থক্য হল, এদের ত্রিমাত্রিক গঠন একে অপরের প্রতিবিম্ব। এ দুই ধরনের অ্যামাইনো এসিডের যে কোনটিই পরস্পরের সাথে সহজে সংযুক্ত হতে পারে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পৃথিবীতে প্রাপ্য সকল প্রোটিনেই অ্যামাইনো এসিডগুলো শুধুমাত্র বাহাতি রূপের। যদি একটিও ডানহাতি অ্যামাইনো এসিড এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তবে তা অব্যবহার্য প্রোটিনে পরিণত হয়।

এখন আমরা যদি ক্ষণিকের জন্য ধরেই নিই যে, জীবন প্রকৃতিতে দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং অ্যামাইনো এসিডগুলোও দৈবাৎ তৈরি হয়ে গেছে, তাহলে তো বাঁহাতি ও ডানহাতি দু'ধরনের অ্যামাইনো এসিডই সমপরিমাণ রাখার কথা এবং প্রতিটি জীবিত জিনিসেই দু'ধরনের আমাইনো এসিডই পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রোটিনে শুধুমাত্র অ্যামাইনো এসিডের বাঁহাতি রূপটিই পাওয়া যায়। এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় কিভাবে প্রোটিনগুলো শুধুমাত্র বাঁহাতি অ্যামাইনো এসিডগুলোকেই গ্রহণ করল, এমনকি একটি মাত্র ডানহাতি অ্যামাইনো এসিডও গৃহীত হলো না? উক্ত সুনির্দিষ্ট ও সচেতন নির্বাচন পদ্ধতি বিবর্তনবাদ তত্ত্বেও জন্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবার একটি প্রোটিন তৈরি হতে হলে, যে নির্দিষ্ট সংখ্যার অ্যামাইনো এসিডকে শুধুমাত্র সঠিকক্রম ও সঠিক ত্রিমাত্রিক আকৃতিতেই সন্নিবেশিত হতে হবে শুধু তাই নয় বরং অ্যামাইনো এসিডগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে যা পেপটাইড বন্ড নামে পরিচিত। অ্যামাইনো এসিডগুলো পরস্পরের সাথে পেপটাইড বন্ড ছাড়াও অন্যান্য বন্ধনে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রে এগুলো শুধুমাত্র পেপটাইড বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে।

এখন আমরা যদি উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে পূর্বোক্ত প্রোটিনটিকে তৈরি সম্ভাব্যতা হিসাব করি যেখানে প্রতিটি অ্যামাইনো এসিড সঠিকক্রমে বাঁহাতি ত্রৈমাত্রিক আকার সহকারে এবং পেপটাইড বন্ধন দ্বারাই সংযুক্ত হতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা একটি সুবিশাল সংখ্যার সম্মুখীন হই। যেটি হল, এ সম্ভাব্যতা $১০^{৯৫}$ বারে ১ বার! আসলে, এই সম্ভাব্যতাটি কাগজে লেখা সম্ভব হলেও বাস্তবে এ সম্ভাব্যতা শূন্য।

বিবর্তনবাদের বড় বড় প্রবক্তারাও জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবর্তনবাদের অসারতার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এটাই বিস্ময়কর যে, তাদের তত্ত্বের সম্পূর্ণ অযৌক্তিকতা দেখার পরও তারা কিভাবে ঔদ্ধত্যের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকে? প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পূর্ণ আদর্শিকভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে।[২০]

এতক্ষণ তো শুধুমাত্র প্রোটিন নিয়ো আলোচনা করা হল। কিন্তু এ প্রোটিনকি একাই তৈরি হয়? না। বরং এ প্রোটিন তৈরির জন্য আছে একটি মেশিনারি। যাতে থাকে DNA ও RNA. কিন্তু এ DNA ও RNA. প্রোটিন পরস্পরের পরিপূরক। DNA ও RNA ছাড়া যেমন সম্ভব নয় প্রোটিন তৈরি হওয়া তেমনি কতগুলো প্রোটিন এনজাইম ছাড়া সম্ভব নয় DNA রেপ্লিকেশন RNA সংশ্লেষণ।

সুতরাং একটি কোষকে সক্রিয় হতে হলে একই সঙ্গে DNA, RNA এবং প্রোটিন একই সাথে বর্তমান থাকতে হবে। আর এ ছাড়া কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, ভিটামিন ও অন্যান্য আয়নতো আছেই। সর্বোপরি এ সকল বিষয় একত্রে নিয়ে যদি একটি কোষের স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিচার করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে তা হয়তো কাগজে লিখেও স্থান দেয়া সম্ভব হবে না।"

রাজীব ভাই তার সাথে আনা ডায়েরি থেকে কথাগুলো পড়ে শোনালেন। একটি কোষের গঠনের রূপ জটিলতা দেখে তৌফিক অবাক হল। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তার সন্দেহ যেন আরও প্রগাঢ় হল। রাকিব মেডিক্যালে পড়ায় মানবদেহ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনেক জেনেছে। কিন্তু রাজীব ভাইয়ের কথায় সে যেন মানবদেহের গঠনের জটিলতা ও সামঞ্জস্যতা নতুনভাবে আবিষ্কার করল। যেখানে একটি ছোট্ট কোষের গঠনই এত জটিল সেখানে মানবদেহের মত অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কীয় প্রক্রিয়াপূর্ণ গঠনের জটিলতা যে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ রইল না।

রাকিব বলল, " প্রথম সৃষ্টি সময়কালে যে পরিবেশের কথা চিন্তা করা হয় তাতে কোন জীবন্ত বস্তুর ন্যূনতম টিকে থাকার সম্ভাবনাই শূন্য। সুতরাং বিবর্তনবাদ একটি অর্থহীন মতবাদ ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

কায়ছার ভাই বললেন, "এ বিষয়গুলোর বিবর্তনবাদী বস্তুবাদীদের কাছে স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের প্রমাণস্বরূপ জীবাশ্ম থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে।

এ ক্ষেত্রে যদিও জীবাশ্ম রেকর্ডে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির জীবাশ্ম পাওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। এরপরও তারা কোন কোন সময় উদ্ধার করা ফসিলকে দু'টি প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং তা ফলাওভাবে প্রচার করেন। তারা ধারণা করেন যে, মাছ হয়ে যায় উভচর প্রাণী আর কোন কোন উভচর প্রাণী হয়ে যায় সরীসৃপ। সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী ও পাখির জন্ম। আর সব শেষে স্তন্যপায়ী থেকে মানুষের উদ্ভব। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে আমরা প্রজাতির উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করতে পারি। তোমরা রাজীবের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই হয়তো জেনে গেছ যে, Fossil রেকর্ড পর্যালোচনা
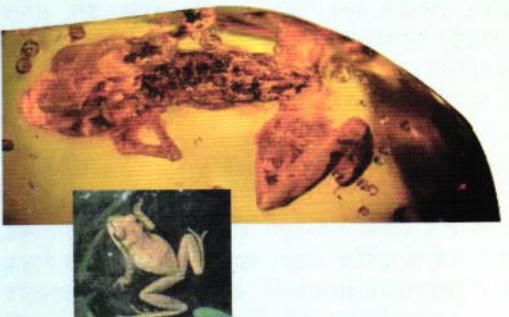
ব্যাঙের উৎপত্তির কোন বিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়নি। জ্ঞাত সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাঙটি মাছ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং এর সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সহকারে আবির্ভূত হয়। আমাদের সময়কার ব্যাঙও ঠিক একই ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে Dominian Republic-এ প্রাপ্ত অ্যামবারে সংরক্ষিত ব্যাঙ ও উক্ত ব্যাঙের বর্তমানে প্রাপ্ত জীবিত নুমুনার মধ্যে কোন পাথর্ক্য নেই

করলে দেখা যায় বিবর্তনবাদীরা রেকর্ডে যেরূপ "Tree of life"- এর উপাত্ত পাবেন বলে ধারণা করেছিলেন অনুরূপ কোন উপাত্ত পাওয়া যায় না। বরং এক্ষেত্রে কোন নিকটবর্তী প্রজাতির জীবাণূ ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট সময়ে অধিকাংশ প্রজাতির স্বতন্ত্র জীবাশ্ম একই সাথে পাওয়া যায়। যেগুলো জীবাশ্ম রেকর্ডে হঠাৎ আবির্ভূত হয়। এই সময়টিকে বলা হয় Cambrian age এবং উক্ত ঘটনাটকে বলা হয় Cambrian Explosions. এ সম্পর্কে Science News Magazine এর রিচার্ড মনটারসকি বলেন, 'প্রায় অর্ধ বিলিয়ন বছর আগে.... প্রাণিকুলের উল্লেখযোগ্য জটিল আকার, যা এখন আমরা দেখি, তা হঠাৎ আবির্ভূত হয়। মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের এই মুহূর্তটি সেই বৈবর্তনিক বিস্ফোরণকে নির্দেশ করে যখন সমুদ্রগুলো পৃথিবীর জটিলতম সৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[২১]

বিবর্তনবাদীরা প্রতিটি পর্বকে অন্য পর্বের বিবর্তনের ফল মনে করে। তারা দাবি করে Chordata পর্বটি একটি অমেরুদণ্ডী পর্ব থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এসেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ব্যাপার হলো। Chordata পর্বের প্রতিটি সদস্য Cambrian age- এ আবর্ভূত হয় যা উক্ত দাবিকে শুরুতেই বাতিল করে দেয়। Chordata পর্বের প্রাচীনতম সদস্যটি হল Pikia যেটি একটি সামুদ্রিক জীব। (প্রথম দর্শনে Pikia কে একটি কৃমির মতো মনে হয়) Pikia-এর পূববর্তী প্রজাতি হিসেবে প্রস্তাবনা রাখা যায় এমন একটি প্রাণীর সাথে Pikia এর আবির্ভাব ঘটেছে একই সময়ে।

....আবার, বিবর্তনবাদীরা মনে করে Pikia প্রজাতিটি ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় মাছে পরিণত হয়। মাছের বিবর্তণ তত্ত্বটিরও কোন জীবাশ্ম প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিলিয়ন মিলিয়ন অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মাছের জীবাশ্ম থাকলেও মাছ এবং অমেরুণ্ডী প্রাণীর মধ্যবর্তী পরিবর্তনকালীন (Transitionalf) একটি জীবাশ্মও নেই।
বরার্ট ক্যারোল প্রথম দিককার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদীদের কোণঠাসা অবস্থার কথা স্বীকার করেন বলেন, Cephalochordate এবং Craniate এর অবস্থান্তরকালীন (Transitional) প্রজাতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যথার্থরূপে নির্ণয় করা প্রাচীতনতম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে Craniate এর যে সকল বৈশিষ্ট্য আমরা জীবাশ্মে আশা করি, তার সবই পাওয়া যায়। এমন কোন জীবাশ্ম সম্বন্ধে জানা নেই যেটাকে চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎপত্তির প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।' বরং মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যে দাবিকৃত "Transitional form" গুলো এইজন্য Transitional নয় যে তাদের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য আছে বরং এজন্য যে তারাই একটি বিবর্তনীয় চিত্রকল্পের প্রিয়বিষয়। Robert Corrol, Zvi Patterns and Process of Vertebrate Evolution, গ্রন্থে এ দু'টি প্রজাতি সম্পর্কে লেখেন যে, Eusthenoptern এবং Aconthostega এর মধ্যে ১৪৫টি অ্যানাটমিকাল বৈশিষ্ট্যের ৯১টির মধ্যেই (!) ভিন্নতা আছে। অথচ বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করে যে এই সবগুলোই ১৫ মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে random mutation এর প্রক্রিয়ায় (?) পুনরায় ডিজাইন হয়েছে। এই ধরনের একটা চিত্রকল্পে বিশ্বাস করা বিবর্তবাদের পক্ষে সম্ভব হলেও এটা বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ঘটনাটি সকল মাছ উভচর প্রাণী বিবর্তন চিত্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"[২২]

রাজীব ভাই বলেন, "বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী স্থলচর চারপদী প্রাণীসমূহ সমুদ্রে বসবাসকারী মাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমাণ হলো কিছু মাছের ডানাগুলো মাংসল। এ মাছগুলো যখন স্থলে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন মাছের ডানাগুলো পর্যায়ক্রমে পায়ে পরিণত হয়। এর বিপরীতে কি প্রমাণ আছে?

কায়ছার ভাই উত্তর দিলেন, "লক্ষ্য রাখা দরকার বিবর্তবাদীদের ঐ দাবিটি একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয় কারণ এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বরঞ্চ এই যুক্তির ধরন লামার্কের যুক্তির মতো। অথচ স্থলে চলতে যে ধরনের সুগঠিত পায়ের প্রয়োজন তার সম্পর্কে না মাছের জানা ছিল, না বস্তজগতের জানা আছে। ডানা ও পা এর কঙ্কালতন্ত্রে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।"

রাজীব যোগ করল, "শুধু তাই নয় জলচর থেকে স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হতে হলে আরও যে সকল সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তা হল-

১. ভার বহন ; জলচর প্রাণীদের শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ওজন বহন করতেই ৪০ শতাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। সুতরাং পানি থেকে মাটিতে পৌঁছানোর জন্য কোন প্রাণীকে একই সাথে নতুন মাংসপেশি ও কঙ্কালতন্ত্র গঠন করতে হবে এবং এটা কোন প্রকার দৈবাৎ মিউটেশনের মাধ্যমে অসম্ভব।

২. তাপ ধারণ: তাদেরকে স্থলের দ্রুত পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সহকারে পানি থেকে মাটিতে আসতে হবে।

৩.রেচনতন্ত্র: স্থলচর প্রাণী ও জলচর প্রাণীদের রেচনতন্ত্রের হঠাৎ আবির্ভাব হতে হবে। কারণ রেচনতন্ত্রে অল্প অল্প পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৪. শ্বসনতন্ত্র : জলচর প্রাণীদের স্থলচর প্রাণীতে পরিণত হতে হলে পূর্ণরূপে প্রস্তুত ফুসফুস নিয়ে আবির্ভূত হতে হবে। [২৩]

এ সকল শর্ত একই সঙ্গে একটি জলচর প্রাণীতে সম্পন্ন হলেই কেবল সেটির পক্ষে স্থলচর প্রাণীতে পরিণত হওয়া সম্ভব। আর কোন মাছের উভচর প্রাণীতে পরিণত হতে হলে এর কঙ্কালতন্ত্রে 'পেলভিস' যোগ হতে হবে। কিন্তু মাছের এমন কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি যার দ্বারা জানা যাবে যে কিভাবে উভচর প্রাণীর 'পেলভিস' গঠিত হয়েছিল। যদি মাছের শিরদাঁড়াকে পেলভিসে রূপান্তরিত হতে হয় তাহলে কোন উভচর প্রাণীতে, যেমন ব্যাঙে সম্পূর্ণ শিরদাঁড়াকে এমনভাবে রূপান্তরিত হবে যে তাতে শিরদাঁড়ার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এছাড়াও এদের মাথার হাড়ও এক রকম নয়। মাছের ডানাকে হতে হবে গিড়াসম্পন্ন ও পেশিময় হাত বা পায়ে। মাছের ফুলকাকে হতে হবে ফুসফুস। এছাড়া মাছ ও উভচর প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য আসতে হবে। অনেক কসরত করা হয়, উভচরকে কোন

যখন তাদের কাছে Coelacanth এর শুধু ফলি ছিল প্রত্যেক বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদ সেগুলো সম্পর্কে কিছু ডারউইনবাদী ধারণা উপস্থাপন করেন; যাই হোক যখন এর জীবিত নমুনা পাওয়া গেল, এর ধরনের সকল ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

নিচে জীবিত Coelacanth -এর উদাহরণ দেখানো হয়েছে। ডানের ছবিটি ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রাপ্ত Coelacanth এর সর্বশেষ নমুনা।
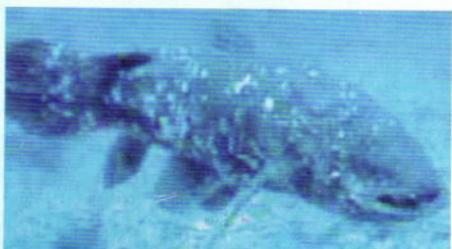
মাছের ডানা এবং পা এর মধ্যে পার্থক্য

বিবর্তনেবাদীদের Coelacanth (সিলাকান্থ) এবং জাতীয় মাছকে "স্থলচর" প্রাণীর পুর্বপুরুষ' বলে মনে করার মৌলিক কারণ হল Coelacanth দের কঙ্কালময় ডানা (bony fin) আছে। তারা মনে করে এই ডানাগুলো পর্যাক্রমে পায়ে পরিণত হয়। যাই হোক,মাছের অস্থি, এবং স্থলচর প্রাণী (যেমন Coelacanth) এর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। চিত্র-১ এ যেরূপ দেখানো হয়েছে Coelacanth এর হাড়গুলো মেরুদণ্ডের সাথে লাগানো নয় অপরদিকে Ichthyostega এর ক্ষেত্রে তা লাগানো (চিত্র-২); একারণে মাছের ডানা পর্যায়ক্রমে পায়ে পরিণত হওয়ার ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এছাড়াও Coelacanth এর ডানা আর Ichthyostega এর পায়ের অস্থির গঠনেও সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মাছের অধস্তন বানাতে। সফল হওয়া যায়নি। লাংফিশ নামক এক মাছকে উভচরের পূর্বপুরুষ বানাতে কসরত করা হয়। এর ফুলকা ছাড়াও রয়েছে সাঁতরানোর জন্য ব্লাডার। যা মাছটি সাময়িকভাবে শ্বাস নিতে ব্যবহার করতে পারে, ডাঙায় উঠলে।

এফ. ডি. ওম্যানি 'দি ফিসেস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন, 'এই প্রাণীর সঙ্গে উভচর প্রাণীর, যা থেকে জমিনে বাস করা মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, কিছু সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এমন ভাবনা সুখবর। কিন্তু তা সত্য নয়, এই প্রাণী সম্পূর্ণ একটি পৃথক শ্রেণী (১৯৫৪, পৃ ৬৫)। [২৪]

তৌফিক বলল, "এখন তাহলে সরীসৃপের সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সরীসৃপ উভচর প্রাণী থেকে এসেছে এটা কি সম্ভব?"

রাজীব ভাই বললেন, "আসলে, একটি অর্ধ মাছ অর্ধ উভচর প্রাণী যেরূপ অসম্ভব তেমনি অসম্ভব একটি অর্ধ উভচর অর্ধ সরীসৃপ। এমনকি জীবাশ্ম রেকর্ডের উক্ত দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।" [২৫]

রাকিব প্রশ্ন করল, "থমাস হাক্সলি বলেন, পাখি হল মহিমান্বিত সরীসৃপ। অর্থাৎ সরীসৃপ পর্যায়ক্রমে পাখিতে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কী?"

কায়ছার ভাই উত্তর দিলেন, "একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সরীসৃপের আদৌ পাখিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। বিবর্তনবাদীরা যেরূপ বলে যে, সরীসৃপ যেমন, কিছু কিছু ডাইনোসর, উড়ন্ত পোকামাকড় শিকার করতে গেলে তাদের সামনের পা দু'টি পাখায় পরিণত হতে শুরু করে, পরে তা উড়তে শিখে এবং পাখিতে পরিণত হয়। অথচ কোন পাখির পাখা পুরোপুরিভাবে গঠিত না হয়ে আংশকি গঠিত হলে তা কখনই উড়তে সক্ষম হবে না। আবার পাখির উড়ার জন্য এর হাড়গুলোকে হালকা হতে হবে। বিশেষ ধরনের ফুসফুস তৈরি হতে হবে। সরীসৃপের আঁশ ও পাখির পালকের তফাৎ আকাশ পাতাল। সুতরাং এ সবকিছুতেই এক মহাপরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়। যা কেবলমাত্র একজন মহামহিম পরিকল্পনাকারীর পক্ষেই সম্ভব।"

কায়ছার ভাই আরও বললেন, "বিবর্তনবাদীরা সাধারণ মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ধোঁকাগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের দাবি বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। আর এক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী হল বনমানুষ। এক্ষেত্রে প্রাণীদ্বয়ের জেনেটিক কোডের সমতুল্যতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। সময়ে সময়ে অনেক বিবর্তনবাদী এ দাবি করেন যে, মানুষ ও এপ ৯৯% জেনেটিক সমতুল্যতা রয়েছে। বিবর্তনবাদীদের প্রতিটি সাহিত্যকর্মে, তুমি এ ধরনের লেখা পড়বে। আমরা মানুষ শিমপাঞ্জির ৯৯ শতাংশ অনুরূপ অথবা মাত্র ১ শতাংশ অনুরূপ অথবা মাত্র ১ শতাংশ DNA

পাখির বিশেষ শ্বসনতন্ত্র
(Birds Special Respiratory System)
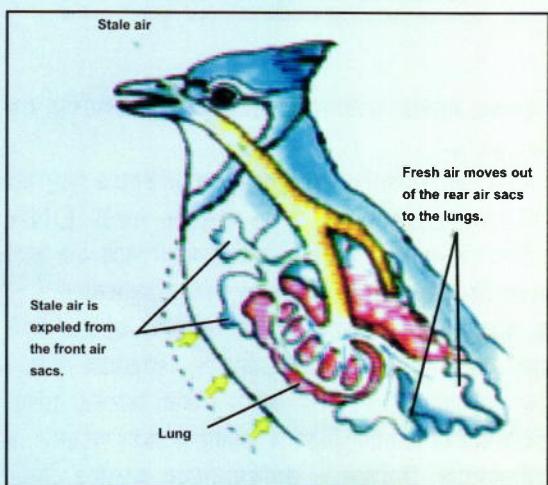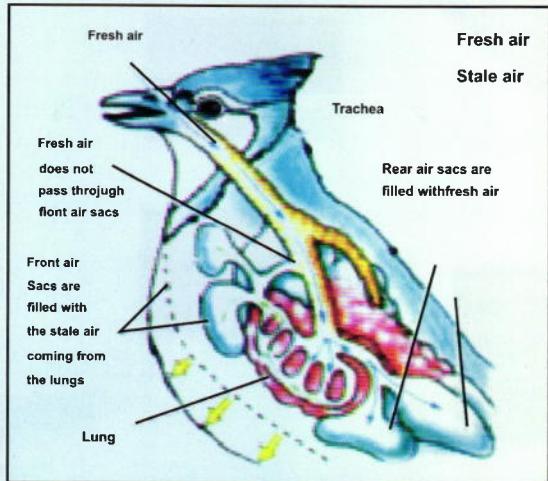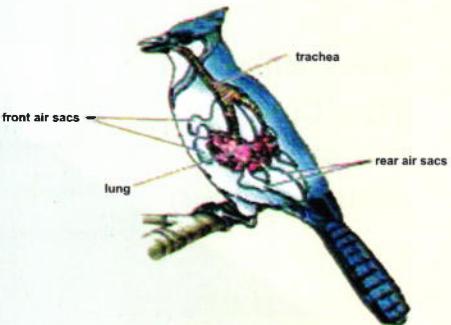
শ্বাসগ্রহণ

বাতাস পাখির শ্বাসনালী দিয়ে এর পেছনের বায়ুথলিতে পৌঁছে। যে বাতাস ব্যবহার করা হয়ে গেছে তা সামনের বায়ুথলিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

শ্বাসত্যাগ

পাখি যখন শ্বাসত্যাগ করে পেছনের বায়ুথলির বিশুদ্ধ বাতাস তখন ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ব্যবস্থার কারণে পাখির ফুসফুসে সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ থাকছে। এই শ্বসনতন্ত্রে অনেক জটিলতা আছে। যা এখানে সরলরূপে দেখানো হয়েছে। যেমন, ফুসফুসের সাথে বায়ুথলিতে যোগস্থলগুলোতে ভালভ আছে, যেন বাতাস সঠিক দিকে প্রবাহিত হয়। এসব কিছুই প্রকাশ করে যে, এখানে একটি পরিকল্পনা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে শুধু ভুল প্রমাণিত করে না বরং এটি স্পষ্টতই সৃষ্টির একটি নিদর্শন।

যখন পাখির পাখাকে নিকট থেকে দেখা হয়, তখন একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্ষুদ্র পশমের ভেতরে আরও ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র পশম আছে এবং তাতে আছে বিশেষ হুক। যেগুলো পশমগুলির একটিকে অপরটির সাথে লেগে থাকতে সাহায্য করে। ছবিতে পর্যায়ক্রমে বড় করে দেখানো পাখির পালক দেখা যাচ্ছে।

আমাদের মানুষ বানায় ইত্যাদি। বরং ২০০২ সালের অক্টোবর একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয় যে, জেনেটিক সমতুল্যতা ৯৯% নয় বরং ৯৫%।

লক্ষ্য করি যে, কিছু বেসিক প্রোটিনের গঠন শুধু শিমপাঞ্জি নয় অন্যান্য প্রজাতিতেও মানুষের প্রোটিনের অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ Nematode কৃমির সাথে মানুষের ৭৫% DNA এর সমতুল্যতা রয়েছে। তার মানে এ নিশ্চয়ই নয় যে, মানুষ ও কৃমির মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ পার্থক্য? প্রকৃতপক্ষে এ সমতুল্যতার কারণ বির্বতন নয় বরং একই ধরনের পরিকল্পনা।

আবার যেহেতু, বিবর্তনবাদ অনুসারে বনমানুষ পর্যায়ক্রমে মানুষে পরিণত হয়েছে তাই এদের মধ্যবর্তী প্রজাতি থাকার কথা এবং অসংখ্য এরূপ জীবাশ্ম পাওয়ার কথা। বিবর্তনবাদীরা এ জন্য পুরোদমে জীবাশ্ম অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। তারা তাদের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু জীবাশ্মকে মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে দেখানো চেষ্টা করেন। এ জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ধোঁকাবাজি, চিত্রাঙ্কন ও প্রচারমাধ্যমের আশ্রয়ও নেন। কিন্তু দেখা যায় একটি মধ্যবর্তী প্রজাতির আবিষ্কার বলে প্রচার করা। কয়েকদিন পরেই তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে (এজন্য হারুণ ইয়াহিয়ার Darwinism refuted বইয়ের ১৪৭-১৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া যেতে পারে)

Imaginary tree of man

ডারউইনবাদীরা দাবি করে যে, আধুনিক মানুষ একধরনের এপ (বনমানুষ জাতীয় প্রাণী) থেকে বিবর্তিত হয়েছে। ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হওয়া এই বিবর্তনপ্রক্রিয়ার মানুষ ও তার পূর্বসূরিদের মধ্যে কিছু অবস্থান্তর প্রাপ্তিকালীন প্রজাতি পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। এই কার্যত সম্পূর্ণ কাল্পনিক চিত্রে, নিচে চারটি মৌলিক প্রকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :

1. Australopithecus
2. Homo habilis
3. Homo erectus
4. Homo Sapiens

Australopithecus এর মাথার খুলি এবং কঙ্কাল আধুনিক এ্যাপ এর খুলি ও কঙ্কালের সাথে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। পাশের চিত্রটিতে বাঁয়ে একটি শিমপাঞ্জি এবং ডানে একটি Australopithecus afarensis কঙ্কাল দেখানো হয়েছে। অ্যানাটমি অধ্যাপক Adrinne L. Zhilman- যিনি ছবিটি এঁকেছেন- ব্যাখ্যা করেন যে, দুটি কঙ্কালের গঠন প্রায় একই রকমের।
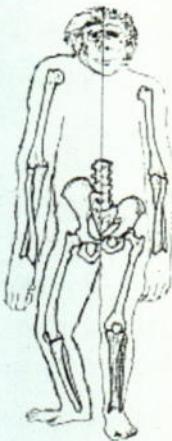
একটি-Australopithecus robustus এর খুলি। এটি আধুনিক বনমানুষের খুলির সাথে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ।

ধারণা করা হয়, এই সৃষ্টিগুলো আফ্রিকাতে প্রথম ৪ মিলিয়ন বছর আগে আবির্ভূত হয় এবং ১ মিলিয়ন বছর আগ পর্যন্ত এরা বেচেঁ থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি Australopithecus হল বিলুপ্ত এ্যাপ যেগুলো বর্তমানে বেঁচে থাকা এ্যাপ (বনমানুষ জাতীয় প্রাণী) প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Good bye Lucy

একসময় Australopithecus প্রজাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে ধরা হত Lucy নামক একটি জীবাশ্মকে। কিন্তু পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ এটিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। খ্যাতনামা ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন Science envie এর ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যা এ ঘটনার সত্যতাকে Good bye Lucy শিরোনামে স্বীকার করে নেয় এবং এটা নিশ্চিত করে যে Australopithecus কে মানুষের পূবসুরি হিসেবে ধরা যায় না।

Afarensis and Chimpanzees

উপরে একটি **Al 444-2 Australopithecus afarensis** খুলি, এবং নিচে একটি আধুনিক শিম্পাঞ্জির খুলি। এখানে যে পরিষ্কার সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা এ বিষয়টির প্রামাণিক নিদর্শন যে **Afaernsis** একটি সাধারণ বন মানুষের প্রজাতি, এত মানুষের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।
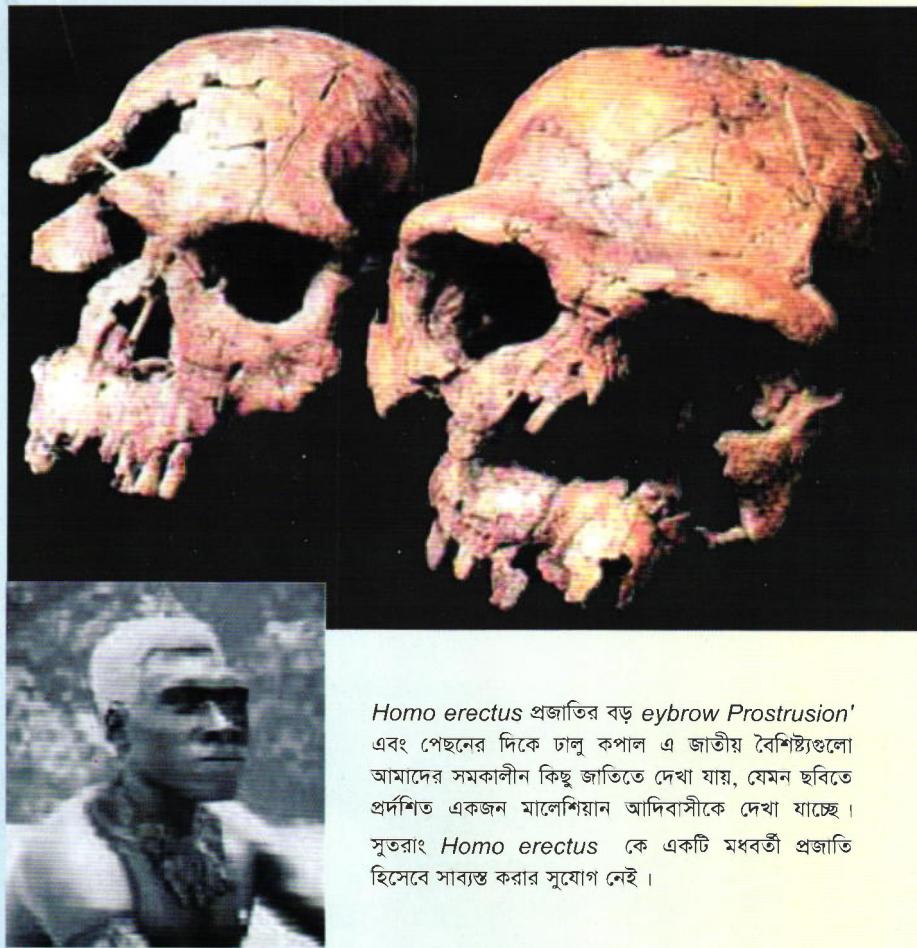
Homo erectus প্রজাতির বড় *eybrow Prostrusion'* এবং পেছনের দিকে ঢালু কপাল এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সমকালীন কিছু জাতিতে দেখা যায়, যেমন ছবিতে প্রর্দশিত একজন মালেশিয়ান আদিবাসীকে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং *Homo erectus* কে একটি মধবর্তী প্রজাতি হিসেবে সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই।

বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদদের প্রবণতা হল নতুন কোন জীবাশ্ম কঙ্কাল আবিষ্কার হলেই হয় তাকে এ্যাপদের নিকটবর্তী বা মানুষের নিকটবর্তী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। অথচ জীবশ্মটি যে এ্যাপ বা মানুষের বিলপ্ত কোন জাতি হতে পারে সে ব্যাপারে তারা সুকৌশলে এড়িয়ে যায় এমনকি অনেক সময় একটি দাঁতের ওপর ভিত্তি করে পুরো একটি নতুন মধ্যবর্তী জাতি দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার মুখমণ্ডলের কঙ্কালের ওপর যে *Facial Reconstruction* করা হয় তাও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিকর। কেননা কারও কারও মুখমণ্ডলের গঠন চর্বি ও মাংসপেশর পরিমাণ ও তুলনামূলক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রাপ্ত কঙ্কালের ওপর ভিত্তি করে সঠিক *Facial Reconstruction* সম্ভব নয়। এসব থেকে স্পষ্ট যে আবিস্কৃত ফসিলগুলো সৃষ্টিতত্ত্বের দিকেনির্দেশ করলেও, তারা বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ ডারউইনবাদকে টিকিয়ে রাখার কারণ বৈজ্ঞানিক নয় বরং আদর্শিক।

১০০০০ বছর পুরনো Homo erectus এই খুলি দুটি ১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার Victoria Kowswamp এলাকায় পাওয়া যায় যে গুলোর নাম দেয়া হয় Kowswamp I এবং Kowswamp V.

Alan Thorne এবং Philip Macumber যারা খুলি (Skull) দুটি আবিষ্কার করেন, এগুলোকে Homo erectus Skull বলেন। অথচ সেগুলোতে Homo erectus এর বিলুপ্তি প্রাপ্ত অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তথাপি এগুলোকে Homo erectus বলার একমাত্র কারণ হল এগুলোর বয়স হিসেব করা হয় ১০,০০০ বছর। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা Homo erectus কে একটি মানুষের প্রজাতি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ তারা বিশ্বাস করত Homo erectus একটি আদিম প্রজাতি এবং তারা আধুনিক মানুষের ৫০০.০০০ বছর আগে বসবাস করত। অনদিকে মানব প্রজাতির বয়স হল মাত্র ১০.০০০ বছর।
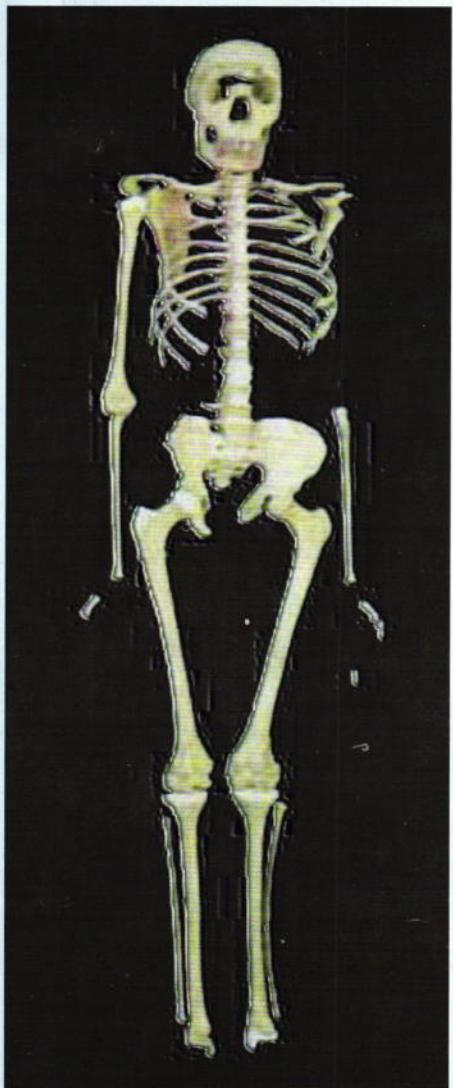
Homo erectus এবং আদিবাসী

পাশের চিত্রে প্রদর্শিত Turkana Boy কঙ্কালটি এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত Homo erectus এর সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য সংরক্ষিত উদাহরণ। মজার বিষয় হল, এই ১.৬ মিলিয়ন বছর বয়সী ফসিলটির সাথে বর্তমান মানুষের কঙ্কালের তেমন কোন তফাৎ নেই। উপরে প্রদর্শিত অষ্ট্রেলিয়ান আদিবাসীর কঙ্কালটি Turkana Boyএর সাথে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ । এ ঘটনাটি আবার প্রমাণ করে যে, Homo erectus মানুষের একটি প্রজাতি বৈ কিছু নয় এবং এর কোন আদিম বৈশিষ্ট্য নেই।

Neanderthal

১,০০,০০০ বছর আগে ইউরোপে মানুষের আবির্ভূত একটি জাতি যারা দ্রুত অন্যান্য জাতির সাথে মিশে যায় কিংবা হারিয়ে যায়। এরা ৩৫.০০০ বছর আগে পর্যন্ত আগে জীবত ছিল। তাদের সাথে আধুনিক মানুষের একমাত্র পার্থক্য হল, তাদের কঙ্কালগুলো আরও বলিষ্ঠ এবং তাদের মাথার ধারণক্ষমতা একটু বেশি।

বিবর্তনবাদীরা এ জাতিটিকে মানুষের আদিম প্রজাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল তথাপি সকল আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, আধুনিক বলিষ্ঠ মানুষ থেকে পৃথক কিছু নয়।

NEANDERTHALS:
একটি মানব প্রজাতি
পাশের চিত্রটিতে ইসরাইলে প্রাপ্ত
Homo sapiens neanderthalensia Amud I
স্কাল দেখানো হয়েছে। হিসেব করা হয়েছে যে, খুলিটি যার ছিল সে ১.৮০ মিটার লম্বা হয়ে থাকবে। এর খুলির মতই - ১৭৪০ সিসি। নিচে
NEANDERTHALS:
জাতির একটি
ফসিল কঙ্কাল এবং তাদের ব্যবহৃত একটি পাথর নির্মিত যন্ত্র দেখানো হয়েছে।
এ ধরনের আবিষ্কার প্রমাণ করে
NEANDERTHALS: প্রকৃতপক্ষে মানব প্রজাতিই ছিল যারা সময়ের ধারাবাহিকতায় হারিয়ে গেছে।

NEANDERTHAL সুচ
ছাব্বিশ হাজার বছর পুরোনো সূঁচ; এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে **Neanderthal** -রা ১০০০০ বছর আগে পোশাক বুনন করতে জানত। **(Dr. Johanson, B. Edger, Page-99)**
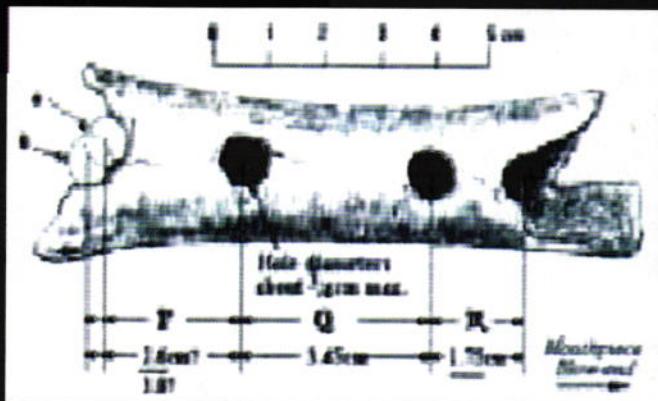
NEANDERTHAL বাঁশি
হাড় দিয়ে তৈরি **Neanderthal-** বাঁশি। হিসেব করে দেখা যায় ছিদ্রগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যেন সঠিক উপসুর পাওয়া যায়। অন্যকথায় বাঁশিটি অত্যান্ত দক্ষকতার সাথে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে।
উপরে গবেষক . **Bob Fink-** এর বাঁশি সংক্রান্ত হিসেবটি দেখানো হয়েছে। বিবর্তনবাদী প্রচারণার বিপরীতে এই আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করে যে, **NEANDERTHAL** মানুষে সভ্য জাতি ছিল, তারা কোনো আদিম গুহা মানব ছিল না। The AAAS Science News Services, Harmoniously," April 3, 1997)

EVOLUTIONISTS VOLTE-FACE REGARDING THE NEANDERTHALS

1975 PORTRAYAL OF NEANDERTHALS- Geheimnisse der urzeit, Deutsche Uberseizung. 1975

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিবর্তনবাদীরা একটি বিলুপ্ত মানবজাতি Neanderthals কে অর্ধ -এপ জাতীয় সৃষ্টি হিসেবে দেখিয়ে এসেছে। বিবর্তনবাদী প্রোপাগান্ডায় কয়েক দশক যাবৎ Neanderthals দেরকে উপরের মত করে দেখানো হত। যাই হোক ১৯৮০ সালের পর থেকে এই রূপকথাটি বিলুপ্ত হতে শুরু করে। ফসিল অনুসন্ধান এবং Neanderthals সাংস্কৃতির অবশেষ থেকে দেখা যায় এই লোকগুলো কোন অর্ধ -এপ ছিল না। উদাহরণসুরূপ এই ২৬০০০ বছর পুরোনো সুঁচটি প্রমাণ করে যে, Neanderthal-রা সভ্য মানুষ ছিল যারা বুনন করতে সক্ষম ছিল। এর ফলে National Geographic এর মত বিবর্তনবাদী প্রকাশনাগুলোতে তাদেরকে সভ্য জাতি হিসেবে দেখানো শুরু করতে হয়।
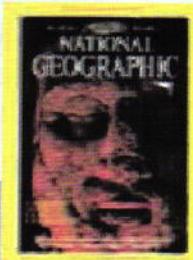
2000 PORTRAYAL OF NEANDERTHALS- National Geographic , july 2000

আধুনিক মানুষের জাতিসমূহের মধ্যে কঙ্কালগত পার্থক্য

বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদা **Home erectus, homo sapiens neanderthaleansis** এবং আর্কাইক **Homo sapiens** মানব জীবাশ্মগুলোকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি বা উপপ্রজাতি হিসেবে দেখানো চেষ্টা করে। তারা উক্ত ফসিল কঙ্কালগুলোর পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যের মধ্যে আছে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যকার বৈচিত্র্য যে জাতিগুলোর কতক বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর কতক মিশে গেছে অন্যান্য জাতির সাথে । সময়ে সময়ে জাতিগুলো যখন একে অপরের সংস্পর্শে আসতে থাকে তখন এ পার্থক্যগুলো ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

এছাড়াও বর্তমান যুগের মানবজাতিগুলোর মধ্যেও উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পৃষ্ঠায় আধুনিক জাতিগুলোর যে কঙ্কালগুলো দেখানো হয়েছে তা উপরে উল্লেখিত জাতিগত পার্থক্যের উদাহরণ। অতীতের অতিক্রান্ত জাতি সমূহের অনুরূপ পার্থক্য উপস্থাপন করে সেগুলোকে বির্বতনের প্রমাণ হিসেবে সব্যস্ত করার প্রচেষ্টা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া

Native Peruvian from the fifteenth century

Middle-aged Bengali

Make from the Solomon Islands (Melanesia) Who died in 1893

Geram male aged 25-30.

Male Congolese aged 35-40.

Male Unuit aged 35-40.
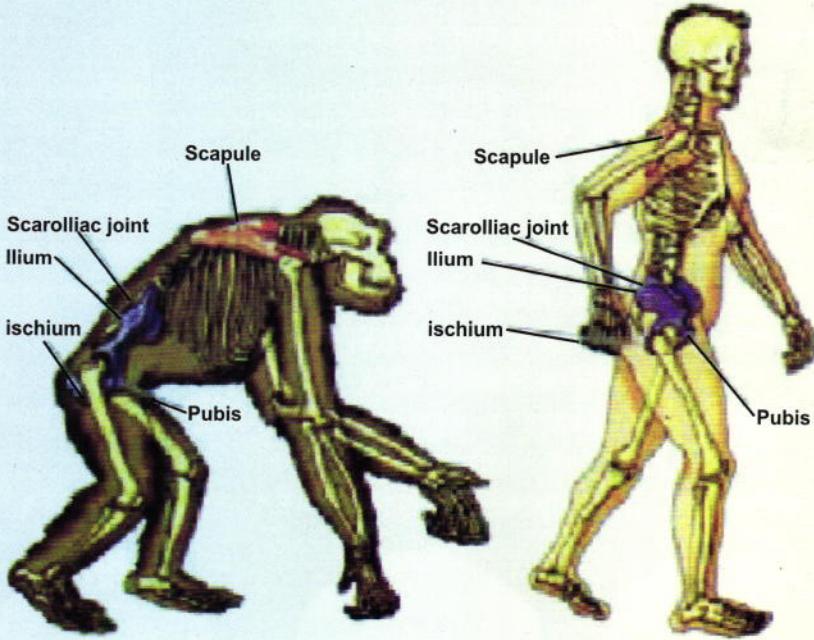
মানুষের কঙ্কালকে দাঁড়িয়ে হাঁটার উপযুক্ত নকশা করা হয়েছে। অপরদিকে এ্যপদের ছোট পা,লম্বা হাত এবং সম্মুখে ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি চার পায়ে চলার জন্য উপযুক্ত। এটা সম্ভব নয় যে, এ্যপও মানুষের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী রূপ (Transitional form) থাকবে। কেননা দ্বিপদী অবস্থাটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার 'উন্নততর অবস্থার দিকে যাওয়ার নীতি' এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অন্যদিকে এ ধরনের মধ্যবর্তী কোন দশার পক্ষে চলাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তৌফিক বলল, " এ সকল বিষয় থেকে তো এটা স্পষ্ট যে বিবর্তন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি মতবাদ। এটি কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, একটি কল্পনা যাকে বস্তুবাদী নাস্তিকরা অর্থ সমর্থন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।"

কায়ছার ভাই বললেন, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসকে মৌলিক চেতনা ধরে নেয়া হয়েছে। ফলে বিজ্ঞানীরা আগে বস্তুবাদী তারপর বিজ্ঞানী। যদি তারা আগে বিজ্ঞানী হতেন তাহলে বিজ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠতো না।"

রাজীব ভাই বললেন, "শুধু তাই নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে শিক্ষা দেয়ার ফলে পৃথিবীর মানব ইতিহাসে বিপর্যয়ের স্রষ্টা হয়েছে তা ওপনিবেশিকতা, নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের হিংস্রতা ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা আগেই জেনেছি বিবর্তনবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল, প্রকৃতিতে সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন এর মধ্য দিয়ে। ডারউইনের মতে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য সার্বক্ষণিক একটি সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রামে শক্তিশালীরা সবসময় দুর্বলের উপর বিজয়ী হয় আর এর ফলে সম্ভব হয় উন্নতি। ডারউইনের বই 'অরিজিন অব স্পিসিস' এর সাবটাইটেলে এই কথাটিকে পেশ করা হয়েছে এভাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মদ্য দিয়ে প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবনযুদ্ধে উপযুক্ত জাতির সংরক্ষণ'।

এ ব্যাপারে ডারউইন থমাস ম্যালথাসের বই An Essay on the Principle of Population থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই বইতে দেখানো হয় যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ম্যালথাস

গণনা করেছিলেন যে মানবজাতিকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দিলে এরা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রতি ২৫ বছরে সংখ্যাটি দ্বিগুণ হতে থাকবে। কিন্তু খাদ্য সরবরাহ কোন ভাবেই সে হারে বাড়বে না। এই তত্ত্বানুসারে, এই অবস্থায় মানবজাতি অপরিবর্তনীয় ক্ষুধামন্দায় পতিত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন ছিল। যে সকল শক্তি মানবজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করছিল তা হল প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, এবং রোগব্যাধি। সংক্ষেপে, কিছু মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন ছিল অপরকিছু মানুষের মৃত্যু। বাঁচার অর্থ বলতে বুঝাতো 'সার্বক্ষণিক যুদ্ধ'। ডারউইন ঘোষণা করেন যে ম্যালথাসের বই থেকে প্রভাবিত হয়েই তিনি 'বাঁচার জন্য সংগ্রামের' ধারণা প্রদান করেন। তিনি বাঁচার জন্য সংগ্রামের এই ধারণাকে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ এর ক্ষেত্রে তথা পুরো প্রকৃতিতে প্রয়োগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালথাসের চিন্তাধারা ইউরোপের ওপরের শ্রেণীর লোকদের প্রভাবিত করে। তারা গরিব ও নিচু শ্রেণীর তথা অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ লোকদের সংখ্যা কমানোর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের চিন্তাভাবনা শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ডে কমবয়সী শ্রমিকদের দৈনিক তিন-চতুর্থাংশ সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। গরিব লোকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের পরিবর্তে কিভাবে আরও নোংরা পরিবেশে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়।

বেদনাদায়ক ভারসাম্য ব্যবস্থা

সামাজিক ডারউইনিজম অনুসারে, যারা দূর্বল, গরিব, অসুস্থ এবং পশ্চাৎপদ কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন না করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এ লোকগুলো মনে করে যে এটা মানুষের বিবর্তন অব্যহত রাখার জন্য খুবেই জরুরি। বিংশ শতাব্দীতে বসনিয়া থেকে ইউথিপিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের কান্নার কোন জবাব না আসার অন্যতম কারণ ছিল এই আদর্শকে তথা সামাজিক বিবর্তনবাদকে সমাজে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা ।

বংশবৃদ্ধি করতে থাকলে ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী মানবজাতির আবির্ভাব হবে এরূপ ডারউইনবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে হিটলার ইউজেনিক্সের নীতি অবলম্বন করে যেখানে পংগু ও মানসিক ভারসাম্যহীনদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ ডারউইনবাদী নীতির ফলেই ইউরোপিয়ান সাদা চামড়ার লোকেরা আফ্রিকান নিগ্রো, রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদেরকে পশ্চাৎপদ বা অনগ্রসর (underdeveloped) আখ্যায়িত করে এবং তাদের সাথে পশুর মত আচরণ করা হয়। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিবর্তনবাদ বস্তুবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের ভিত্তিকে শক্ত করে ডারউইনবাদের ফলে যখন এ ধারণা প্রগাঢ় হয় যে বস্তু থেকে পর্যায়ক্রমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তখন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। ধর্মকে মানব রচিত বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা ধর্মকে আফিম বলতেও দ্বিধান্বিত হননি। অন্যকথায়, ডারউইনবাদের প্রবর্তনের ফলেই মানুষে মানুষে হানাহানি বৃদ্ধি পায়, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়, মানুষের মধ্য হতে দয়া অনুগ্রহ ও সহানুভূতি হ্রাস পায় এবং মানুষের নৈতকতার চরম অধঃপতন ঘটে।[২৬] (এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য হারুণ ইয়াহিয়ার 'Darwinism's Social Weapon' Disaster Darwinism Brought to Humanity' বই দুটি পড়া যেতে পারে।)

তৌফিক এ কথা শুনে ডারউইনবাদের ভয়াবহতা বুঝতে সক্ষম হল এবং তার মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর যেন পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকল।

উপরের ছবিতে প্রদর্শিত ব্রেসলেটদ্বয়ের বাম পাশেরটি মার্বেল দিয়ে তৈরি এবং ডান পাশেরটি তৈরি ব্যাসাল্ট দিয়ে। এ দুটোর সময়কাল হল ৮৫০০ এবং ৯০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন সে সময় শুধু পাথর নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারিত হত। কিন্তু ব্যাসাল্ট এবং মার্বেল অত্যন্ত কঠিন বস্তু। এগুলোকে বাঁকা এবং গোল করে সংযোগ করতে অবশ্যই স্টিলের ব্লেড ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। স্টিলের যন্ত্রপাতি ছাড়া এগুলোকে কাটা ও নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়া অসম্ভব। আপনি যদি কাউকে একটি পাথরের তৈরি যন্ত্র দেন এবং তাকে দিয়ে ব্যাসাল্ট থেকে উপরের ছবির মত ব্রেসলেট তৈরি করতে বলেন তারা কতটুকু সফল হবে ? একটা পাথরকে আরেকটার সাথে ঘষলে অথবা একটা অপরটার সংগে

সংঘর্ষ করাইলে নিশ্চয়ই অনুরূপ কোন ব্রেসলেট তৈরি হবে না। বরং উপরে প্রদর্শিত আর্টিকেলগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে এগুলো যারা করত তাদের যথেষ্ট সৌন্দর্য্যবোধও ছিল।

এই ছবি দুটিতে হাড় ও অবিসিডিয়ানের তৈরি হস্তশিল্প, আংটা ও পাথর নির্মিত বিভিন্ন বস্তু দেখা যাচ্ছে। স্পষ্টতই, কেউ এ ধরনের সুগঠিত আকার শুধু মাত্র পাথর দিয়ে কাঁচামাল আঘাত করে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে না। আঘাতে, হাড় ভেঙে যাবে, ফলে প্রত্যাশিত গঠনটি পাওয়া যাবে না। একই রূপে, গ্রানাইট এবং ব্যাসাল্টের মত সর্বাধিক শক্তিশালী পাথর দিয়ে নির্মিত যন্ত্র দিয়েও তীক্ষ্ণ ও ধারালো পার্শ্ব ও সুচালো প্রান্ত তৈরি করা সম্ভব নয়। এই পাথরগুলো ফল কাটার মতই খুব নিয়মিত (Regular) ভাবে কাটা হয়েছে। এদের উজ্জ্বলতা এদেরকে পালিশ করার ফলেই হয়েছে। যারা এইগুলো তৈরি করেছে তাদের কাছে এর জন্য প্রয়োজনীয় স্টীলের কিংবা লোহার মাধ্যম অবশ্যই ছিল। শক্ত পাথরের খণ্ডকে অনুরূপ সুচারুরূপে কাটা শুধুমাত্র এর চেয়ে মজবুত কোন পদার্থ যেমন স্টিলের পক্ষে সম্ভব।
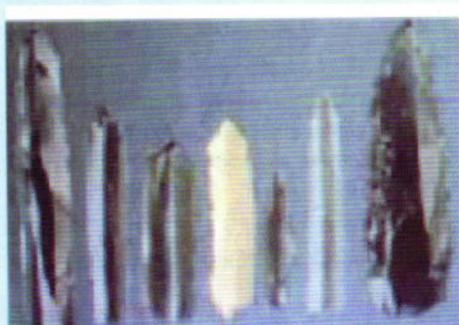
রাকীব বলল, "আমি চিন্তা করে দেখলাম, মানব ইতিহাসকে বিবর্তনবাদীরা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছে। তাদের ধারণা এই যে মানুষ এক সময়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, এরপর দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শেখে। এ সময়ে তারা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত, তখন ছিল প্রস্তর যুগ। পর্যায়ক্রমে আসে ব্রোঞ্জ যুগ তারপর লৌহযুগ। মানুষ যখন প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখে তখন থেকে সভ্যতার সূচনা হয়। যে সকল ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এ সব হয় তাতে সাধারণ অকাট্য কিছু যুক্তিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন :
লৌহ দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং তথাকথিত প্রস্তর যুগে লৌহ ব্যবহার হয়ে থাকলেও তা পাওয়া যাবে না। আবার ব্রোঞ্জ তৈরির জ্ঞানতো লৌহ ব্যবহারের জ্ঞানের চেয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা। সে হিসেবে লৌহযুগ ব্রোঞ্জের যুগের আগে আসার কথা, পরে নয়।
কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন পাথর কিংবা হাড় নির্মিত অলংকার ও যন্ত্রপাতি দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব জিনিসের নিখুঁত গঠন ও ডিজাইন করতে হলে পাথর হতে মজবুত কোন পদর্থ যেমন, লোহা বা স্টিলের তৈরি যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যেহেতু লোহা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায় সেহেতু সে যন্ত্রগুলো এখন আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ বিবর্তনবাদীরা এ সকল অকাট্য যুক্তি সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। আবার বিবর্তনবাদীরা বিভিন্ন গুহায়প্রাপ্ত বিভিন্ন অঙ্কন দেখে বলে যে এগুলো আদিম গুহা মানবদের তৈরী। সে চিত্রগুলো আঁকতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে তা এমন কি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও মুছে যায়নি বা ক্ষয় হয়নি? দেখা গেছে যে, আধুনিক যুগের জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেও সেই রঙটি পুনঃপ্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি কোন কোন চিত্রে যে ত্রিমাত্রিক গঠন পাওয়া যায় এবং যে সাদৃশ্যজ্ঞান পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র অত্যন্ত দক্ষ ও শিক্ষিত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হারুন ইয়াহিয়ার Stone Age : A Historical Lie বইটি পড়া যেতে পারে।)
এটা সুস্পষ্ট যে, মানব ইতিহাসে প্রস্তরযুগ লৌহযুগের ধারাবাহিকতা আনার চেষ্টা করা হয় বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে না ছিল প্রস্তরযুগ না ছিল আদিম মানুষ। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সকল মানবজাতি প্রাথমিকভাবে সভ্য ছিল। কিন্তু আমার ধারণা পরবর্তীতে তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদের অনুসরণ না করার কারণে স্রষ্টা তাদেরকে অসভ্য ও আদিম বানিয়ে দিয়েছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের অস্তিত্ব যখন পৃথিবীর জন্য হুমকির স্বরূপ হয়ে গেছে তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"
কায়ছার ভাই বললেন, "বস্তুবাদী, ভোগবাদী দর্শনকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য বিবর্তনবাদকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের এক রিপোর্টে Confession of a Professed Atheist শীর্ষক প্রবন্ধে Aldous Huxley নিজেই স্বীকার করেছেন : পৃথিবীকে না বুঝবারই ইচ্ছা আমার ছিল। পরিণতি হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, এ ধারণা কারোর নেই এবং ধারণার যথেষ্ট কারণ বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না। আমার নিজের কথাই বলি, আমার অধিকাংশ সমসাময়িক লোকের কোনই সন্দেহ নেই যে, অর্থহীনতাই ছিল মুক্তি লাভের একটা অপরিহার্য হাতিয়ার। আমরা যুগপৎ নিস্কৃতি চেয়েছিলাম বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এবং এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতা থেকে। আমরা নৈতিকতার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছি। কেন না তা আমাদের যৌন স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। (পৃষ্ঠা-১৯) (মাওলানা আব্দুর রহীম লেখেন) বস্তুত নৈতিক বাধাবন্ধন ও বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা ও প্রবণতাই হলো ক্রমবিকাশবাদ বিশ্বাস করার মূল কারণ। আর ক্রমবিকাশ দর্শনে বিশ্বাসীদের যারা নিজেদের ইতর প্রাণী ও হীন ক্রমবিকাশ বাদে বিশ্বাসীদের নৈতিক অবস্থা দেখলেই তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে।[২৭] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সচেতন চিন্তাভাবনা এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলেছে। যে প্রতিটি প্রাণহীন বস্তু ও প্রতিটি জীবকেই সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভারসাম্যপূর্ণভাবে। অকাট্য ও খুঁতবিহীন পরিকল্পনার মাধ্যমে। তাই আমাদের উচিত সেই সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। যিনি আমাদের অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আর এ জন্য মহান আল্লাহ প্রেরিত ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত মুজিজা কুরআন তো আছেই। সাথে আছে হাদিসে রাসূল।"

কায়ছার ভাই বলেন, "এ জন্যই আল্লাহ বলেন, 'সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসৃত। মিথ্যা তো অপসৃত হতে বাধ্য।" (আল কোরআন, সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৮১)

রচনা : মো আবদুল্লাহ সাঈদ খান

৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

রচনা : মোঃ আবদুল্লাহ সাঈদ খান, ৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, abdullahdmc@gmail.com

তথ্যসূত্র

01. Harun Yahaya, Darwinism Refuted, PDF type: p.20
02. Harun Yahaya, Darwinism Refuted, PDF type: p.20
03. Harun Yahaya, Darwinism Refuted, PDF type: p.22
04. Harun Yahya, The Dark spell of Darwinism Doctype: p.11
05. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype; p.11
06. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype: p.19
07. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype; p.20
08. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype; p.21
09. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype; p.22
10. Harun Yahya; The Religion of Darwinism; Doctype; p.12
11. Harun Yahya; Darwinism; Refuted; PDF Type
12. Charles Darwin: The Origin of Species: Indian edition; p. 159
13. Robert L. Caroll; Pattern and Process of Vertebrata Evolution; Cambridge edition, p. 151 Collected from Darwinismrefuted; p. 43
14. Harun Yahya, Darwinism Reuted, PDF type; P. 54
১৫. মাওলানা আব্দুর রহীম, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব; খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪; সংগ্রহ- পৃ. ৫২
১৬. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমূল কোরআন, সংগ্রহ- পৃ. ৫৩
17. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 193
18. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 191
19. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 195, 196
20. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 198
21. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. p. 199-203 emphasis added
22. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p.71
23. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 55
24. Harun Yahya, Darwnism Refuted, PDF type; p. 55
25. মুহাম্মদ সিদ্দিক, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব; মদীনা প্রকাশনী, ২০০৩
27. Harun Yahya, The Collapse of Theory of Evolution in 20 Question; Idarat Iswat- E- Diniyat (p Ltd; New Delhi 2003; P. 46, 49
28. Harun Yahya, Disaster Dawinism Brought to Hmanity, PDF type; P.
29. মাওলানা আব্দুর রহীম, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব; খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ ; পৃ- ১৪৬
30. আর্টিকেলে ব্যবহৃত ছবিগুলো হারুন ইয়াহিয়ার Darwinism Refuted, Evolution Deceit, A Historical Lie: Stone Age, Collaps of evolution in 20 Questions disaster Darwinism Brought to Humanity বইগুলো থেকে সংগৃহীত। বই এর উৎস www. harunyahya.com

Medical Education
চিকিৎসা শিক্ষা

বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা চিকিৎসা বিজ্ঞান, যা মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে জড়িত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অধ্যয়নের সুযোগসমূহ নিচে বর্ণিত হলো :

MEDICAL SCIENCE

- **Graduation**

MBBS (Medicine, Surgery, Gynae)

- **Post Graduation**

Medicine

1. Internal Medicine
2. Paediatrics
3. Cardiology
4. Nephrology
5. Neurology
6. Endocrine
7. Skin & Venereal diseases
8. Chest Specialist
9. Oncoogy

শিশু বিশেষজ্ঞ
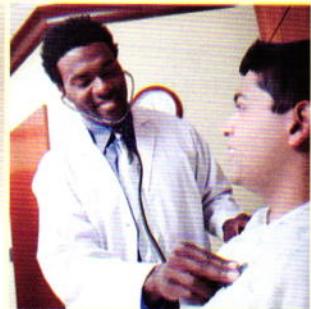
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

একজন সার্জন, যার প্রয়োজন **Eagle's Eye, Lion's Heart** এবং **Lady's Finger**

Surgery

1. General Surgery
2. Urology
3. Orthopedics
4. Eye Surgery
5. Ear, Nose, Throat (ENT)
6. Cardio Thoracic Surgery
7. Thoracic Surgery
8. Spinal Surgery

Gynae

1. Gynaecology
2. Obstetrics

একজন গাইনি বিশেষজ্ঞ, যাকে একাধারে মহিলাদের যাবতীয় রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি ধাত্রীবিদ্যায়ও পারদর্শী হতে হয়।

এছাড়াও

1. **Radiology and Imaging**
2. **Anasthesiology**
3. **Hematology**

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর-

১ এমবিবিএস (অনার্স কোর্স)

২. বিডিএস (অনার্স কোর্স)

৩. ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি

MBBS

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) কোর্সটি দেশের একমাত্র কোর্স যেখানে একই সাথে দু'টি বিষয়ে (মেডিসিন ও সার্জারি) অনার্স করানো হয়।

সময়কাল

MBBS কোর্সটি ৫ বছরব্যাপী। এরপর ১ (এক বছর) ইন্টার্নশিপ রয়েছে। তবে ইন্টার্নি করার সময় ডাক্তারগণ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাতা পেয়ে থাকেন।

যা পাড়ানো হয়

First Professional Exam : প্রথম ১ বছর ৬ মাস

1. Anatomy
2. Physiology
3. Bio-chemistry
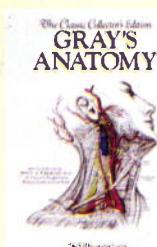
Anatomy পাঠ্যবই
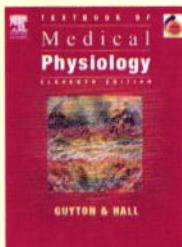
Physiology পাঠ্যবই
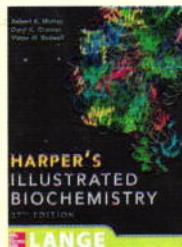
Biochemistry পাঠ্যবই

Second Professional Exam : দ্বিতীয় ২ বছর

1. Phthology
2. Microbiology
3. Pharmacology
4. Forensic Medicine
5. Community Medicine
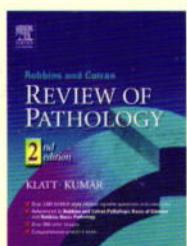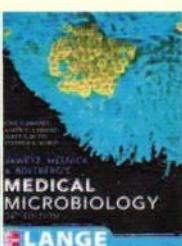
Phthology পাঠ্যবই

Microbiology পাঠ্যবই
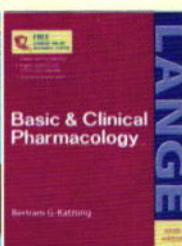
Pharmacology পাঠ্যবই
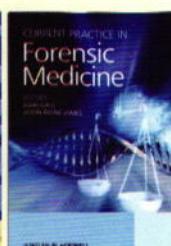
Forensic Medicine পাঠ্যবই
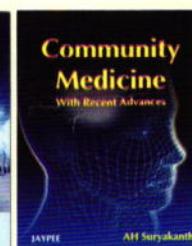
Community Medicine পাঠ্যবই

Final Professional Exam : শেষ ১ বছর ৬ মাস

1. Medicine
2. Surgery
3. Gynae
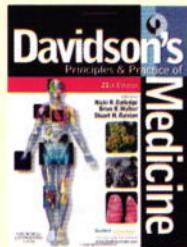
Medicine পাঠ্যবই
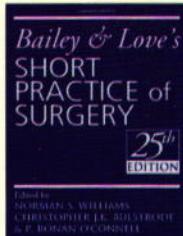
Surgery পাঠ্যবই
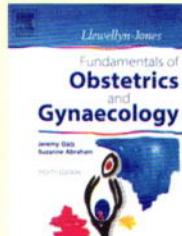
Gynae পাঠ্যবই

৫ বছরব্যাপী এ কোর্সটিতে : (অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, সার্জারি ও গাইনকোলজি) ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এখন থেকেই এমবিবিএস ডিগ্রি দেয়া হয়।

গুরুত্ব

সমাজে ডাক্তারদের বড় রকমের চাহিদা রয়েছে। সেই অনাদিকাল থেকে ডাক্তারগণ সমাজের অবকাঠামোর অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে টিকে আছেন। সমাজের সর্বত্রই ডাক্তারদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সম্ভবত পেশাগত মর্যাদার দিক থেকে ডাক্তাররাই সবার চেয়ে এগিয়ে। এজন্যই ডাক্তারদের বলা হয় "The Second God." এই পেশায় একদিকে যেমন সম্মান রয়েছে অন্যদিকে হালাল উপায়ে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনেরও সুযোগ রয়েছে। একজন ডাক্তার শুধু MBBS ডিগ্রি নিয়েও এই সমাজে সম্মানের সাথে টিকে থাকতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

এই ডিগ্রি নেয়ার পর একজন ডাক্তার যেমন সরাসরি চিকিৎসাসেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং ক্লিনিক্যাল সেক্টরে উচ্চতর ডিগ্রি যেমন MD/Ms (চিকিৎসাশাস্ত্রে মাস্টার্স কোর্স) অথবা FCPS (বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান এ্যান্ড সার্জনস কর্তৃক প্রদত্ত) MRCP (রয়েল কলেজ অব ইংল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত) ইত্যাদি করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে পারেন আবার এমবিবিএস করার পর বিভিন্ন Non-Clinical subject যেমন Health Economics, Public Health, Microbiology, Embryology, Biotechnology Genetic Engineering, Immunology, Biochemistry ইত্যাদির মত অসংখ্য কোর্সে Masters or PhD. করতে পারেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ

বিষয় রেটিং

চাহিদার দিক থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিষয় সমূহের পাশাপাশি ডাক্তারিও শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রতি বছর মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শীর্ষ মেধাবীরা। পেশা হিসেবে ডাক্তারি বেছে নেয়ার জন্য ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

কোথায় পড়ানো হয়

আমাদের দেশে বর্তমানে ১৫টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এর সবগুলোতেই MBBS কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে আসন সংখ্যা ২১১০টি। ছাত্রদের পছন্দ ও মেধাস্থান অনুযায়ী কে কোন মেডিক্যাল চান্স পাবে তা নির্ধারিত হয়।

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

সরকারি মেডিক্যাল কলেজ গুলোর নাম-

১. ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
২. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
৩. বেগম খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
৪. ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ।

এম.এ.জি. ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

৫. চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম।
৬. রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী।
৭. সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট।
৮. শের-এ- বাংলা মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল।
৯. কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা।
১০. খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, খুলনা।
১১. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়া।
১২. রংপুর মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর।
১৩. ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর।
১৪. দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুর।
১৫. পাবনা মেডিক্যাল কলেজ, পাবনা।
১৬. আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।

শের-এ বাংলা মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

১. বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ধানমন্ডি, ঢাকা।
২. বি.জি.সি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম।
৩. ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেলথ সাইন্সেস, চট্টগ্রাম।
৪. মেডিক্যাল কলেজ ফর উইমেন্স, উত্তরা ঢাকা।
৫. জরিনা শিকদার মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, রায়ের বাজার, ঢাকা।
৬. ইবনে সিনা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
৭. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী।
৮. সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা।

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়া

বেগম খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজ

রংপুর মেডিক্যাল কজেল

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ

৯. ডা. ইব্রাহীম মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১০. জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট।
১১. ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, জনসন রোড, ঢাকা।
১২. কম্যুনিটি বেইসড মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ।
১৩. নর্থ ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট।

১৪. হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১৫. নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১৬. ইস্ট ওয়েস্ট মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১৭. ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা।
১৮. এনাম মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১৯. ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, গাজীপুর।
২০. জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।
২১. খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজ, এনায়েতপুর শরীফ, সিরাজগঞ্জ।
২২. কুমুদ্দিনী মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল।
২৩. মাওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
২৪. নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ।
২৫. সিলেট উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট।
২৬. শাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
২৭. তাহিরুননেসা মেডিক্যাল কলেজ, গাজীপুর।
২৮. সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ (গণবিশ্ববিদ্যালয়), সাভার, ঢাকা।

ফরিদপুর মেডিক্যাল কজেল

খুলনা মেডিক্যাল কজেল

সাধারণত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্তির পর এ দেশের প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে খরচ অত্যন্ত বেশি।

উচ্চশিক্ষা

মেডিক্যাল সাইন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার জন্য বাংলাদেশ একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেটি হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত। এখানে Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology, Microbiology, Forensic Medicine, Community Medicine, Pharmacology, Cardiology, Urology, Nephrology, Haematology ও Gynaecology (মেডিসিন, কম্যুনিটি মেডিসিন, ফার্মাকলোজি, কার্ডিওলজি, ইউরোলজি, নেফ্রলজি, হেমাটোলজি, ও গাইনোকলজিতে) এমফি, এমডি করা যায়।

ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি
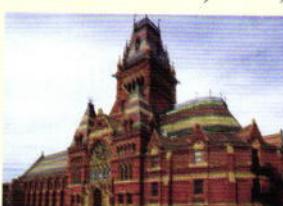
হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

হল ইয়র্ক মেডিক্যাল স্কুল

এ ছাড়া সার্জারি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন General Surgery, ENT, Orthopedic Surgery, Neurosurgery, Spinal Surgery, Cardiothoracic Surgery, Hepatobilliary Surgery (জেনারেল সার্জারি, ই.এন.টি. অর্থোপেডিক সার্জারি, নিউরোসার্জারি, স্পাইরাল সার্জারি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি) প্রভৃতি বিভাগে এমএস (MS) করা যায়।

এ ছাড়াও শীর্ষস্থানীয় ৮টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এমডি বা এমএস (MS) করার সুযোগ রয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- NICVD জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, NITOR বা পঙ্গু হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, প্রভৃতি স্থানে ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষা নেয়া যায় আর নিপসম এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নন-ক্লিনিক্যাল বা গবেষণামূলক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস

বিদেশে ভর্তি

মেডিক্যাল এডুকেশন খুব ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে নিজ খরচে বিদেশে পড়ার খরচ চালানো কষ্টসাধ্য। এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই যেকোন ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রতি বছর কোর্স ফি হিসাবে বাংলাদেশী টাকার ৪০-৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এজন্য সাধারণত ছাত্ররা দেশেই MBBS পাস করে বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য বিদেশে গমন করে। সেক্ষেত্রে খরচ কিছুটা কম হয়। বিদেশে ডিগ্রি নেয়ার ক্ষেত্রে Royal University of England. 'রয়াল ইউনিভার্সিটি অব ইংল্যান্ড' সবার চেয়ে এগিয়ে। এখান থেকে FRCS অথবা MRCP ডিগ্রি নিতে পারলে বিশ্বব্যাপী এর স্বীকৃতি রয়েছে। এ ছাড়া এডিনবার্গ, গ্লাসকো ও আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকেও ডিগ্রি নেয়া যায়।

ইউনির্ভাসিটি অব কুইন্সল্যান্ড

এর অনেকগুলোর, প্রথম কয়েকটি অংশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকেও দেয়া যায়। যেমন MRCP, MRCS- এর প্রথম দু'টি অংশই কলকাতা থেকে দেয়া যায়। এই সকল ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি নেয়ার সুবিধা হলো এই যে, এই ডিগ্রি নেয়ার পর ডাক্তারগণ বিশ্বের যেকোন দেশে ডাক্তারি করতে পারবেন। এমবিবিএস ও ইন্টার্নি করার পর ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতে বিদেশে স্কলারশিপ খুবই নগণ্য। তবে কয়েক বছর ট্রেনিং থাকলে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় হাসপাতালে অব-সারভারশিপ ও পরবর্তীতে ফেলোশিপ পাওয়া যেতে পারে। কিংবা নন-ক্লিনিক্যাল বিষয় বা গবেষণার জন্য খুব সহজেই স্কলারশিপ পাওয়া যায় এবং এক্ষেত্রে গবেষকের জন্য খুব লোভনীয় চাকরির সুযোগ রয়েছে।

ফেইনবার্গ স্কুল অব কুইন্সল্যান্ড

কলকাতা ইউনির্ভাসিটি

ইউনির্ভাসিটি কলেজ লন্ডন

রয়েল কলেজ

চাকরি

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারগণের জন্য চাকরির যথেষ্ট সুবিধা আছে। এ ছাড়া ডাক্তারগণ ইচ্ছা করলে বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে সরকারি ক্যাডারভুক্ত হয়ে চাকরি করতে পারেন। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও তারা পর্যাপ্ত চাকরির সুবিধা পাবেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান- জাতিসংঘ, WHO, CARE, ইত্যাদিসহ অন্যান্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ডাক্তারগণের জন্য চাকরির ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশ থেকে পাস করা বহু ডাক্তার এখন বিদেশে চাকরিরত আছেন।

স্কলারশিপ

মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এ সংক্রান্ত বৃত্তির সংখ্যা নগণ্য।

দেশে

(ক) ডাক-বাংলা ব্যাংক বৃত্তি

(খ) ইমদাদ সিতারা বৃত্তি

(গ) ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বৃত্তি (শুধুমাত্র মেয়েদের)।

বিদেশে

(ক) মনোবুশো বৃত্তি (পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য),
(খ) কমনওয়েলথ বৃত্তি (পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য),
(গ) ব্রিটিশ কাউন্সিল বৃত্তি (পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য)।

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

ডেন্টাল সার্জারি

যা পড়ানো হয়

গ্রাজুয়েশন লেভেল ডেন্টাল বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি BDS (Bachelor of Dental Surgery) কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া ১ বছর ইন্টার্নিশিপ চালু রয়েছে।

ডিমান্ড

মেডিক্যালের পাশাপাশি দেশে ডেন্টালের চাহিদা ব্যাপক। বিসিএস-এর সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চাকরির সুবিধা থাকায় অনেক পিতামাতাই তাদের সন্তানদের এই বিষয়ে পড়াতে আগ্রহী হন। তা ছাড়া প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা তো রয়েছেই। সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি সততার সাথে অর্থ উপার্জনের সুযোগ এই পেশার জন্য বাড়তি আকর্ষণ।

একজন ডেন্টাল সার্জন

কোথায় পড়ানো হয়

দেশে সরকারি ডেন্টাল কলেজ বর্তমানে ৩টি।
এগুলো হলো-
(ক) ঢাকা ডেন্টাল কলেজ
(খ) চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট
(গ) রাজশাহী মেডিক্যাল করেজ ডেন্টাল ইউনিট
মোট আসন সংখ্যা ২০৫টি।
এছাড়া দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেল BSMMU (IPGMR) থেকে এই বিষয়ে ডিগ্রি নেয়া যায়।

বিদেশে ভর্তি

"ডেন্টাল" এডুকেশন, মেডিক্যাল এডুকেশনের মত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে গ্রাজুয়েশন লেভেলে বিদেশে ভর্তি কষ্টসাধ্য। গ্রাজুয়েশন লেভেলে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য Russia, Canada, England, Ireland এ ভর্তির সুযোগ রয়েছে। তবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে ডিগ্রি নেয়ার জন্য বিদেশে নামীদামি কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের ডিগ্রি সারা বিশ্বেই স্বীকৃত। এদের মধ্যে Royal College of England অন্যতম।

স্কলারশিপ

ডেন্টাল বিষয়ে বৃত্তির সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ-
দেশে : (ক) ডাচ-বাংলা ব্যাংক বৃত্তি (খ) ইমদাদ সিতারা বৃত্তি
বিদেশে : (ক) মনোবুশো বৃত্তি, জাপান (খ) কমনওয়েলথ বৃত্তি

চাকরি

বিসিএস-এর মাধ্যমে সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজসমুহে চাকরি নিতে পারেন। ডেন্টাল ডাক্তারগণের জন্য বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও চাকরির

ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া তারা চাইলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা ক্লিনিকেও চাকরি নিতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ডিগ্রি নিয়ে বিদেশের বিভিন্ন দেশে চাকরির জন্য যেতে পারেন।

হেলথ টেকনোলজি

বাংলাদেশে ঢাকা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন শহরে বেশ কয়েকটি সরকারি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট ও প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ঢাকায় বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেমন- সাভারে সিআরপি-এর বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনস ইনস্টিটিউট। এসব প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল টেকনোলজি যেমন Radiology/Imaging, Physiotherapy, Language Therapy, Occupational Therapy, Pharmacy, Pathology & Lab Technology, Paramedics (রেডিওলজি/ইমেজিং, ফিজিওথেরাপি, ল্যাংগুয়েজ- থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, ফার্মেসি, প্যাথলজি এন্ড টেকনোলজি, প্যারামেডিক্স) প্রভৃতি বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং অনার্স কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সের সুবিধা হচ্ছে এসএসসি পাস করার পরই তা করা যায়। এ সকল বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে প্রচুর চাকরি খালি আছে এবং দেশের বাইরেও উচ্চ শিক্ষার্থে যাওয়ার সুযোগ আছে।

চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে

আরো বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলো কোন না কোনভাবে চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত এবং যে কেউ ক্যারিয়ার হিসেবে এ পেশাগুলো গ্রহণ করতে পারেন। নিচে এদের কয়েকটি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো-

হেলথ ইকোনমিক্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে হেলথ ইকোনমিক্স পড়া যায়। বড় বড় এনজিও WHO,UNICEF ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোয় খুব লোভনীয় বেতনের চাকরির সুযোগ রয়েছে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়ে স্কলারশিপ দেয়া হয়। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই অঙ্কের মেধা থাকতে হবে।
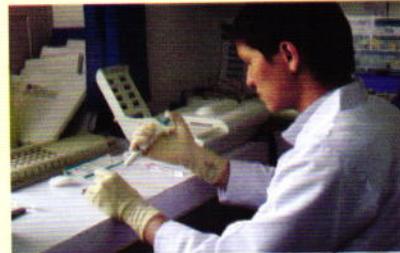
হেলথ টেকনিশিয়ান-চিকিৎসা বিজ্ঞানে এদের ভূমিকাও অনেক
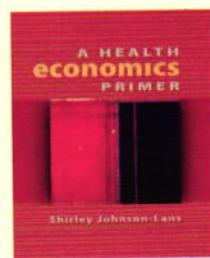
হেলথ ইকোনোমিক্স বই

পুষ্টি বিজ্ঞানের বই

পুষ্টিবিজ্ঞান

হাসপাতালে ডায়েটিশিয়ান হিসেবে চাকরির সুযোগ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যায়।

Health Management : বড় বড় হসপিটাল পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে এ বিষয় গড়ে উঠেছে। এমবিবিএস করার পর এ বিষয়ে মাস্টার্স করা যায় অথবা সরাসরি বিবিএ (BBA) করে হেলথ ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করা যায়।
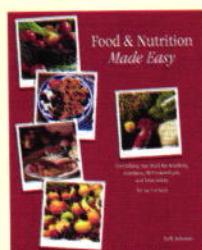
লেখক

ডা. মো: বেলায়েত হোসাইন (আরিক)
arikssmc@gmail.com
arikssmc@yahoo.com

Engineering Education In Home and Abroad

সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছে প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ছাড়া সভ্যতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক প্রযুক্তিবিদরাই কেবল পারেন বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি করতে।

Engineering শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বুয়েট। BUET এ যে Subject গুলো পড়ানো হয় মূলত সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই আলোচনাটি তৈরি করা।

রেজিস্ট্রার বিল্ডিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

Electrical & Electronic Engineering (EEE)
Electrical & Communication Engineering (ECE)
Telecommunication Engineering (TE)

ভূমিকা

আমাদের দেশে এখন একজন জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রীকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, বড় হয়ে সে কী হতে চায় তবে বেশির ভাগেরই উত্তর হবে- ইঞ্জিনিয়ার/ডাক্তার। আরা যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাদেরকে যদি বলা হয় কোন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ওপর সে কাজ করতে চায়- নিঃসন্দেহে বেশির ভাগই বলবে ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই দৃশ্যটা শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একই।

বিষয়বস্তু

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক শাখাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে–

১. পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং

পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিদ্যুতের উৎপাদন, স্থানান্তর ও বিতরণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রগুলোর ডিজাইন ও
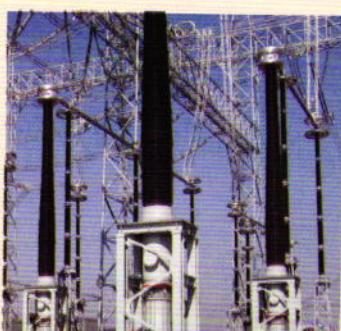
সার্কিট ব্রেকার

মেইনটেনেন্স যেমন- ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও মোটর এবং উচ্চ-বিভব পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স।

২. কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিভিন্ন ডাইন্যামিক সিস্টেমের মডেলিং এবং বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোলারের ডিজাইন। এ সব কাজে ব্যবহৃত উপাদানগুলো বিদ্যু বর্তনি, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রোসেসর, মাইক্রোকন্ট্রোলার, PLC ইত্যাদি।

কম্পিউটার মাদার বোর্ড

৩. ইলেক্ট্রনিক্স

ইলেক্ট্রনিক্স বর্তনির ডিজাইন, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ধর্ম নিয়ে আলোচনা ও ব্যবহার। ট্রান্সমিটার, রিসিভার, রেডিও টেলিভিশন, বিভিন্ন গৃহস্থালির অ্যাপ্লায়ান্সের ইলেক্ট্রনিক ডিজাইন, মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদির ডিজাইন।
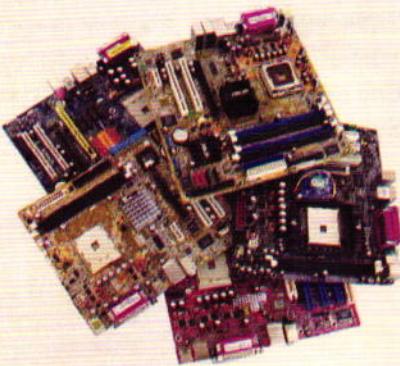
৪. মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স

খুব ছোট্ট ইলেক্ট্রনিক বর্তনি যা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) গুলোতে ব্যবহৃত হয়-এতে ব্যবহৃত রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর, মাইক্রোস্কোপিক লেভেল সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস দিয়ে তৈরি হয়। বর্তমান আলোচ্য বিষয় VLSI, ULSI, ন্যানোটেকনোলজি ইত্যাদি।

৫. সিগন্যাল প্রোসেসিং

বিভিন্ন অ্যানালগ/ডিজিটাল সিগন্যাল, বিশ্লেষণ-সিগন্যাল ফিল্টারিং, অ্যামপ্লিফিকেশন, ফিল্টারিং, মডিউলেশন/ডিমডিউলেশন, কম্প্রেশন, এরর ডিটেকশন/কারেকশন ইত্যাদি। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য খুবই জরুরি বিষয়।

৬. টেলিকমিউনিকেশন্স

কোন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক সিগন্যালের ট্রান্সমিশন এই সব চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য, মডিলেশন (AM/FM), ডিজিটাল মডিলেশন (ASK/PSK/FSK/GNSK), সুইচিং ট্রান্সমিটার, রিসিভার ট্রান্সসিভার ইত্যাদি ডিজাইন। বিভিন্ন টেকনোলোজি GSM/CDMA, w-HSPA, LTE WiMAX ইত্যাদি।

মোবাইল কমিউনিকেশন টাওয়ার

৭.ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

চাপ, প্রবাহ, তাপমাত্রা ইত্যাদি ফিজিক্যাল কোয়ানটিটি মাপার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ডিজাইন। বিভিন্ন সেন্সর, মিটার ইত্যাদি।

৮. কম্পিউটার

কম্পিউটার সিস্টেমের ডিজাইন-খুবই প্রিমিটিভ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক কম্পিউটার হার্ডওয়ারের ডিজাইন, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার, বিভিন্ন PDA, Mobile handset এর ডিজাইন এর অন্তর্ভুক্ত। কম্পিউটার সিস্টেম সফ্‌টওয়ারের ওপরও কাজ করতে হয়।

চাহিদা ও ভবিষ্যৎ

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয়বস্তুর যে আলোচনা আমি ওপরে করলাম তা থেকে নিশ্চয়ই আপনি ধারণা করতে পারছেন এই বিষয়টির চাহিদা কী পর্যায়ে হতে পারে। সমগ্র বিশ্বটা তো আজ এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এর ব্যাপক চাহিদা অতীতেও যেমন সব সময় ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বিশেষত আগামী ৫-৬ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটদের/মাস্টারদের চাহিদা ইঞ্জিঃ বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে আশা করা যায়। আর উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা তো সর্বদাই থাকবে।

বিষয় রেটিং

বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রাজুয়েশনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থান প্রথম। গত ৫-৬ বছর থেকে ট্রেন্ড চালু হয়েছে। এর আগে BUET-এর অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। প্রথম অবস্থানে ছিল কম্পিউটার সাইয়ান্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং।

বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান

গ্রাজুয়েশনের জন্য বাংলাদেশে এবং বিদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান রয়েছে-

স্টানফোর্ড ইউনির্ভাসিটি, আমেরিকা

ক) দেশে- সরকারি

BUET- হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এরপর রয়েছে KUET, RUET এবং CUET। আপনি যদি SSC এরপর Polytechnical institute থেকে Diploma করে থাকেন, তবে আপনি graduation এর জন্য DUET-। ভর্তি হতে আপনাকে খুবই কঠোর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম সারিতে থাকতে হবে। KUET এ আছে Electrical and Communication Engineering. (ECE) ভি EEE কাছাকাছি। RUET-এ বিষয়ের নাম Electrical and Telecommunication Engineering (ETE)

খ) দেশে- বেসরকারি

আন্তর্জাতিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের গাজীপুরে রয়েছে- Islamic University of Technology (IUT), এ প্রতিষ্ঠানে EEE তে BSC ডিগ্রি দেয়া হয়। মানও খুব ভালো। কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বাংলাদেশে যে গুলোতে EEE/ Telecommunication (TE)/ ECE/ETE নামের subject পড়ানো হয়। এদের মধ্যে রয়েছে-আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (AUT), নর্থ-সাউথ ইউনি. (NUS), ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনি. EWU), স্টামফোর্ড উইনি. (SU), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনি. অব বাংলাদেশ (AIUB) ইত্যাদি।

(গ) বিদেশে
বিশ্বের প্রায় সব দেশেই খ্যাতনামা/মাঝারি সব মানের বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটে EEE/BCE/TE/ETE বিষয়টি পড়ানো হয়। তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন, ভারত, ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন, রাশিয়া ইত্যাদি। তবে BSc লেভেলের জন্য এ সব University- তে খুব খরচ। তবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এগুলো খুবই ভালো।

উইন্ড পাওয়ার প্লান্ট

টাইডাল পাওয়ার প্লান্ট

সোলার পাওয়ার প্লান্ট

নিওক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট

স্কলারশিপ
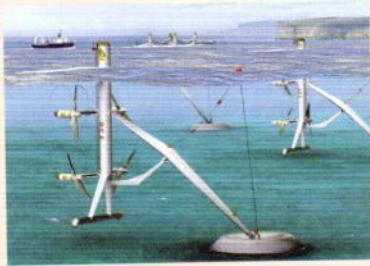
গ্রাজুয়েশন লেভেলে সব সরকারি ইঞ্জিঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটি কারিগরি বৃত্তি সব ছাত্র/ছাত্রীকে দিয়ে থাকে। ফাইনাল পরীক্ষাগুলোর রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু বৃত্তি দিয়ে থাকে। যেমন - Dean's list এ থাকলে বৃত্তি, A+ পেলে বৃত্তি ইত্যাদি। এছাড়া খোঁজ করলে অনেক ফাউন্ডেশন পাওয়া যায় যারা Result এর ওপর বৃত্তি প্রদান করা। কিছু জেলাভিত্তিক ফাউন্ডেশন রয়েছে যারা নিজ নিজ জেলার শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন Technical magazine এ থিসিস/রিসার্চ পেপার জমা দিয়েও বৃত্তি পাওয়া যায়।

উচ্চতর শিক্ষা
বলতে গেলে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিঃ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগের অভাব নেই- দেশে কি বিদেশে। প্রচুর Funding/ বৃত্তিও পাওয়া সম্ভব।

(ক) দেশে
দেশের সব সরকারি ইঞ্জিঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই MSc ডিগ্রি দিয়ে থাকে। তবে BUET থেকে PhD ও করা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি MSc ডিগ্রি প্রদান করে। তবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষত PhD এর জন্য/ রিসার্চভিত্তিক উচ্চতর গবেষণার জন্য দেশের চেয়ে বিদেশে পড়াশোনাই অধিকতর জনপ্রিয় এবং মানসম্পন্ন।

(খ) বিদেশে

উচ্চতর শিক্ষার জন্য কিছু কিছু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক জনপ্রিয়। যেমন- আমেরিকা কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মান, সুইডেন, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে USA-ই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মানসম্পন্ন। এসব দেশে উচ্চশিক্ষা ব্যক্তিগত খরচে/ University Funding এ/বৃত্তির মাধ্যমে নেয়া যেতে পারে। USA-এর University গুলোয় Apply করতে হলে আপনাকে GRE টেস্ট দিতেই হবে। আর প্রায় সব দেশের জন্যই আপনার TOL/IELTS লাগবে। আপনার BSc Result ভাল হলে, GRE Score ভাল থাকলে (USA)- এর জন্য), TOEFL/IELTS থাকলে, কিছু প্রকাশিত গবেষণাপত্র থাকলে, আপনি সহজেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সম্মতি পেয়ে যেতে পারেন। USA- তে তিন রকমের স্কলারশিপ রয়েছে-TA (Teacher Assistantship), RA (Research Assistantship) এবং FELLOWSHIOP. TA ও RA তে আপনাকে কাজ করতে হবে। আর Fellowship- এ কোন কাজ করতে হয় না।

চাকরির ক্ষেত্রে

EEE এর Graduate/ Master দের চাকরির ক্ষেত্র অনেক-

(ক) দেশে-সরকারি

-B.C.S general
-B.C.S technical (electrical যেমন- বিদ্যুৎ বিভাগ, T&T, DESA ইত্যাদি)
-PDB, PGCB
-BUET, KUET, RUET, CUET এবং অন্যান্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষকতা।

(খ) দেশে-বেসরকারি

-Mobile Operators (যেমন- Grameenphone, Aktel, Banglalink, Warid Telecom, Teletalk ইত্যাদি)
-International telecom vendors যেমন- Ericssson, Huawei, Motorola ইত্যাদি।
-Local telecom vendors subcontractors যেমন- Power trade ইত্যাদি অনেক রয়েছে।
-Landphone/PSTN Operators যেমন- Bangla CAT, Summit ইত্যাদি।
-Private University গুলোতে শিক্ষকতা।
-IC নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যেমন Power IC ইত্যাদি।

(গ) বিদেশে

- বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশে নিয়ে যায়। যেমন-ভারত, জার্মানি, সৌদি আরব ইত্যাদি।

-বিভিন্ন Mobile operator-এ কর্মরত Engineer অনেক সময় Circular পেয়ে দেশের চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যায়।

-International telecom vendor company গুলো অন্যান্য দেশে বাংলাদেশ থেকে Engineer পাঠায়।

উপরের আলোচনা গেল শুধুমাত্র BSc/MSc Engineer-দের চাকরিক্ষেতে নিয়ে। যারা P h D করে দেশে পা দেবেন তারা দেশের University-গুলোতে শিক্ষকতা করতে পারেন। অথবা Consultancy Firm চালাতে পারেন। কিন্তু তাদের জন্য Suitable অন্য কোন Job opportunity দেশে নেই। এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের বিষয়। দেশে Industrialization/outsourcing না হলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ কারণেই বিদেশে কর্মরত অনেক P h D holder বাংলাদেশে ফেরত আসতে চাইলেও পারেন না, বিদেশেই থেকে যান। আমরা আশা করি অচিরেই আমরা আমাদের এই সমস্যার সমাধানকল্পে বৃহত্তর উদ্যোগে সবাই এগিয়ে আসবো।

Mechanical Engineering (ME)

ভূমিকা

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার প্রাচীনতম, মৌলিক এবং সুবিস্তৃত শাখাটি হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ইহা ভারী শিল্পকারখানার সাথে জড়িত এবং পৃথিবীর প্রায় সব বড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। এর চাকরির ক্ষেত্র সুবিশাল ও পৃথিবীর সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান।

বিষয়বস্তু

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তথা যন্ত্রকৌশল এর মৌলিক বিষয় হল Fuel তথা জ্বালানি। জ্বালানি শব্দটি ছোট হলেও ইহা ছাড়া সমগ্র পৃথিবী অচল। সম্পূর্ণ পৃথিবীর অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা, একটি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের উন্নতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি সঙ্কটের কথা চিন্তা করে এখন থেকে জ্বালানি অপচয়রোধ এবং বিকল্প জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছে। জ্বালানি ছাড়া চলবে না যানবাহন, ফলে প্রাত্যহিক জীবন হয়ে যাবে স্থবির। জ্বালানি ছাড়া চলবে না শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। ফলে পৃথিবী ডুবে যাবে অন্ধকারে। কোন দেশের যুদ্ধ জয় কিংবা প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার জন্য তাকে তার সেনাবাহিনী ও অস্ত্রসামগ্রী সচল রাখতে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তিনটি উপ (Sub) বিভাগে পড়ানো হয়। এগুলো হল- (1) Control (2) Automobiles (৩) Robotics.
এ তিনটি প্রধান শাখার প্রায়োগিক ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

রোবট-মানুষের বিস্ময়কর আবিষ্কার

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এদেশে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান খুবই কম। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাকরিক্ষেত্র কিছুটা সীমিত। সীমিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- BUET, CUET, KUET, RUET, IUT এবং আরও দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এর কারণ হলো এ বিষয়টি হালকা ও ভারী সব ধরনের শিল্পকারখানার সাথে সম্পর্কিত বিধায় শিক্ষা উপকরণসমূহ খুবই দামি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যবহৃত মাঝারি আকারের একটা বয়লারের দাম প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। অত্যাধুনিক সংস্করণের দাম আরও অনেক বেশি। এ ধরনের প্রায় ৪-৫ টি বয়লার আমাদের BUET তে আছে। Heat engine lab এর Installation (অত্যাধুনিক) কয়েক কোটি টাকা খরচ অবধারিত। মেশিনশপও পিছিয়ে নেই। পুরনো যন্ত্রপাতি নিয়ে সমৃদ্ধ মেশিনশপ গড়তে খরচ কোটি টাকা অতিক্রম করবে। এ জন্য একথা বলা যায়, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অর্থ উপার্জনের যে ক্ষেত্র অনেক বড় পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণের মূল্য কিংবা ক্রয়ের ক্ষেত্র ও অর্থ ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত ও ভাল ক্ষেত্র।

বিশ্বপ্রেক্ষাপট

বিশ্বপ্রেক্ষাপটে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পড়াশোনার ক্ষেত্র ও চাকরির ক্ষেত্র সুবৃহৎ। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন, পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ সব কিছুতেই থাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিত। পৃথিবরি শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান। মেকানিক্যালের প্রধান দু'টি ক্ষেত্র Control ও Automobiles আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে
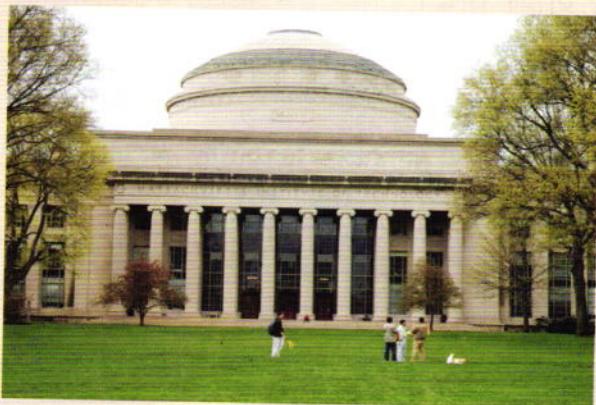
মেচাচুচ্যাটস্ ইন্সটিটিউ অব টেকনোলজি (MIT)

জড়িত। একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে Design যা কোন যন্ত্র তৈরির পূর্বে তার পরিকল্পনাকে বোঝায়। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের বিষয়বস্তু যেমন মহাকাশ বিদ্যা, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি সবকিছুই এর আওতায় রয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে একজন দক্ষ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সুদক্ষ পরিকল্পনা ও পরিচালনা। Robotics ও Mechotronics এ দু'টি বিষয়ের পুরোধা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আরেকটি বিষয় neat tramper এর ক্ষেত্র রয়েছে কম্পিউটার সামগ্রীর উৎপাদনে। যোগাযোগব্যবস্থা ও যানবাহন, ইঞ্জিন এ সব ক্ষেত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যাবতীয় দিক এ ছোট পরিসরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। একথা নিঃসন্দেহ যে, সকল উৎপাদন ও শিল্পকারখানায় রয়েছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

Civil & Environmental Engineering (CEE)/ Civil Engineering (CE) Water Resources Engineering (WRE)

বিষয়বস্তু

বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, বাঁধ, উঁচু টাওয়ার, এয়ারপোর্ট, সুয়ারেজ লাইন, পানির পাইপ লাইন, বর্জ্য নিষ্কাশন ও রিসাইক্লিং সিস্টেম, ভূমিকম্পের কারণ ও প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চাহিদা

উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল যে কোন দেশের জন্যই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশে ভাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা অত্যন্ত বেশি এবং এর প্রকট অভাব অনুভূত হচ্ছে। এদেশে এখন প্রচুর Real estate বা construction/consultation ফার্ম আছে, যেগুলোতে প্রচুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দরকার। এছাড়াও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের সরকারি চাকরির সুযোগ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের তুলনায় অনেক বেশি। এই পেশায় পেশাগত জীবনে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হলে বৈধ পথে প্রচুর অর্থ ও সম্মান অর্জন করা যায়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

বিষয় রেটিং

বর্তমানে BUET- এ এই সাবজেক্টের অবস্থান অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুসারে তৃতীয় (যে কোন সময় পরিবর্তনযোগ্য, এটি কোন অফিসিয়াল রেটিং নয়, শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের ভিত্তিতে এটি নির্মিত)।

কোথায় পড়বেন

ক) দেশে : BUET, KUET, RUET, CUET এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন- North South, Stamford, Ahsanullah ইত্যাদি। শাবিপ্রবি-তে সিভিল অ্যান্ড ইনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং (CEE) এবং অন্যান্য কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে।

খ) বিদেশে : প্রায় সব খ্যাতনামা Technical Institute এবং University- তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে। তবে Stamford University কর্তৃক প্রদত্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির মান খুব উন্নতমানের। এ ছাড়াও MIT সহ অন্যান্য Institue/University-তেও সর্বোচ্চ মানের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

দুবাই এর " বুরুজ আল আরব" সুমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বের একমাত্র সেভেন স্টার হোটেলটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।

বৃত্তি

দেশে ও বিদেশে উভয় জায়গাতেই Term Final পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় বৃত্তি প্রদান করা হয় (ডিপার্টমেন্টের পক্ষে থেকে)।

উচ্চশিক্ষা

ক) দেশে : BUET-এ সিভিলের বিভিন্ন বিষয়ে ওপর MS এবং P h D করা যায়। শাবিপ্রবি-তেও CEE- এর ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

খ) বিদেশে : বিদেশের প্রায় সব খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে Civil Engineering এর ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

চাকরির ক্ষেত্র

- B,C,S General
- B,C,S Technical (Civiln, যেমন -C&B, LGED, R&h)
- PWD
- REAL ESTATE
- CONSTRUCITON FARM
- CONSULTING FARM
- MOBILE/LAND PHONE COMPANY

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

-UNDP
- WHO

বিভিন্ন NGO (যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে)

- BUET, KUET, RUET, CUET, DUET, শাবিপ্রবি প্রভৃতি সরকারি এবং Stamford, Ahsanullah, Presidency প্রভৃতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা
- অন্যান্য সকল জায়গায় যেখানে Graduate-রা চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারেন
- অন্যান্য সকল কোম্পানি/ফ্যাক্টরি

Computer Science & Engineering (CSE)/ Computer Science & information Technology (CSIT)/ Computer Science(CS)

বিষয়বস্তু

- সফটওয়ার তৈরির বিভিন্ন কৌশল
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কৌশল
- অটোমেশনের বিভিন্ন কৌশল
- কমিউনিকেশনের বিভিন্ন ধাপ ও কৌশল

কম্পিউটার প্রযুক্তির বাহক

কোথায় পড়বেন

বাংলাদেশের প্রায় সব ক'টি Public বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, BUET, RUET, DUET, KUET, CUET সব কয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব কয়টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে Computer Science অথবা Computer Science and Engineering অথবা Computer & Information Technology বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়।

দেশের বাইরে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পড়ানো হয়।

স্কলারশিপ

(ক) দেশে-ভার্সিটি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিয়াউর রহমান ICT স্কলারশিপ।

(খ) বিদেশে- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/ কোম্পানি কর্তৃক গবেষণা বৃত্তি।

চাকরি

প্রযুক্তি খুব দ্রুত অগ্রসর না হলেও আমাদের দেশে আজ থেকে ৫০ বছর আগে থেকেই Computer এর ব্যবহার হয়ে আসছে। সরকারি Sector গুলোতে বিশেষ করে পরমাণু শক্তি কমিশন, Traffic Controlling, E-Governance, Satellite Transmission, রেল যোগাযোগ-এ কম্পিউটার এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এই সমস্ত field এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া সম্ভব আবার বেসরকারি সেক্টরসমূহে CSE বা CS এর গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ আরও বেশি। এসব ক্ষেত্রে এদের পদের নাম হয়ে থাকে-

i. Software Engineer & Programmer.
ii. IT Professional
iii. Network Administration, System Analyst

iv. Web Mastering & Developing
v. Graphics Designer
vi. Simulation & Animation এর কাজের জন্য চলচ্চিত্রে Special effect তৈরিতে Cartoon ছবিগুলোতে এর ব্যবহার চলছে বর্তমান সময়ে।
vii. Virtual reality এর মাধ্যম হিসেবে
viii. Desktop publishing বিভিন্ন বইপুস্তক লেখালেখি, ছাপানো
ix. Multimedia:একই সাথে Test, Source, Static & dynamic image নিয়ে কাজের মাধ্যমে অনেক বাস্তবসম্মত কাজ করা যায়।

ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টা, কানাডা

Industrial & Production Engineering (IPE)

বিষয়বস্তু

- প্রডাকশন ম্যানেজমেন্ট
- ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট
- মেকানিক্যাল ম্যানেজমেন্ট
- প্রফিটেবল মেকানিক্যাল ডিজাইন

চাহিদা

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে এই বিষয়ের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। একই সাথে একজন বিজনেস ম্যানেজার এবং প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ একজন আইপিই ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে করানো সম্ভব বলে ভবিষ্যতেও এর ব্যাপক চাহিদা থাকবে বলে আশা করা যায়। এর একজন ছাত্রকে Leadership Quality অর্জন করানোই এর Main ফোকাস।

কোথায় পড়বেন

(ক) দেশে : বুয়েট, শাবিপ্রবি, রুয়েট, কুয়েট।

(খ) বিদেশে : কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন- আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউ: মালয়েশিয়া ইত্যাদি জায়গায় এবং অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট" নামে IPE এর প্যারালাল সাবজেক্ট আছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে আগ্রহ থাকলে আপনার সঠিক ঠিকানা হবে Industrial & Production Engineering

স্কলারশিপ

-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপার্টমেন্টাল স্কলারশিপ।
-বিদেশে বিভিন্ন প্রডাকশন কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত স্কলারশিপ
-বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে

উচ্চশিক্ষা

(ক) **দেশে:** বুয়েট, শাবিপ্রবি

(খ) **বিদেশে :** প্রায় সব খ্যাতনামা ও মাঝারি মানের Varsity- তে উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ও চাহিদা আছে।

চাকরি

১. Multinational Companies যেমন British American Tobacco (BAT), Nestle, Unilever, Cheveron etc.)

২. প্রডাকশন কোম্পানি, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, গার্মেন্টস

৩. ম্যানেজমেন্টের কাজের জন্য যেকোন কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস এক্সিকিউটিভ হিসেবে।

Material and Metallurgical Engineering (MME)

বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন মৌল ও পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ
- মেটালের বিভিন্ন রকম বিক্রিয়া, পলিমারাইজেশন ইত্যাদি
- মেটাল দ্বারা তৈরি বিভিন্ন জিনিসের ধর্ম এবং সেগুলো তৈরির কৌশল
- খনি থেকে মেটাল উত্তোলন, পরিশোধন এবং ব্যবহারের কৌশল
- সিরামিকস্‌, প্লাস্টিক

চাহিদা

দেশে এ বিষয়ের চাহিদা মোটামুটি। তবে বিদেশে এ বিষয়ের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বিশেষত যেসব দেশ খনিসমৃদ্ধ, সেসব দেশে 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং' Materials Science/Engineering নামে এ বিষয়েরই একটি প্যারালাল (সমান্তরাল) বিষয়ে চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি-এখানে Material Science পড়ানো হয়

ভবিষ্যৎ

- ভবিষ্যতে এ বিষয়ের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।
- Steel, Ceramics & Plasit Industry- বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোথায় পড়বেন

(ক) দেশে : BUET, RAJSHAHI UNIVERSITY
(খ) বিদেশে : অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্কলারশিপ

(ক) দেশে : ভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত
(খ) বিদেশে : গবেষণা পরিচালনা করার জন্য উন্নত বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ এবং টিচিং অ্যাসিসট্যান্টশিপ দেয়া হয়ে থাকে।

চাকরি

(ক) দেশে :

- গাজীপুর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি
- পেট্রোবাংলা, তিতাস গ্যাস
- ইস্পাত রিফাইনিং কারখানাগুলোতে
- ধাতব জিনিস তৈরির কারখানায়/ কোম্পানিতে
- পলিমার ও কম্পোজিট ফ্যাক্টরিতে
- সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিতে
- Re-rolling মিলসগুলোতে

(খ) বিদেশে :

- বিভিন্ন মাইনিং, মেটালসংক্রান্ত এবং ধাতব বস্তু তৈরির কোম্পানিতে ।

উচ্চতর শিক্ষা

(ক) দেশে : BUET, Rajshahi University (Materials Science).
(খ) বিদেশে : MIT সহ প্রায় সব খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ।

Naval Architecture & Marine Engineering (NAME)
Marine Engineering (ME)

সম্প্রতি বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় জাহাজ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে

বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন রকম নৌযান ডিজাইন ও তৈরির কৌশল
- পরিচালনার কৌশল
- পরিত্যক্ত নৌযান থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরির কৌশল ।

চাহিদা

বাংলাদেশে এ বিষয়টির ডিমান্ড মাঝামাঝি। তবে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর যথেষ্ট চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু নেভাল আর্কিটেকচার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটো বিষয়ে সমন্বয় হওয়ায় নেভাল আর্কিটেক্ট অথবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এর যেকোন একটিতে চাকরির সুযোগ পাওয়া যায়।

ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে যেহেতু ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণের পথে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে, তাই ভবিষ্যতে এ বিষয়ের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

চাকরি

-শিপইয়ার্ডে, ডকে (DOCK)
- দেশী ও বিদেশী, সরকারি এবং বেসরকারি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জাহাজে
- Bangladesh Navy, BIWTA,BIWTC

উচ্চতর শিক্ষা

(ক) দেশে : BUET-এ MS / P h d করতে পারবেন।
(খ) বিদেশে : বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবেন।

Chemical Engineering

মূল পাঠ্যক্রম

Chemical বা Process industry-তে যে সব যন্ত্রপাতি বা Equipment and instrument যেমন Reactor, Heater, HF, Pump, Compressor, Controller etc. ব্যবহৃত হয় সেগুলোর Application scope, Design and Limitation নিয়ে পড়া। তবে BSc'র পাঠ্যক্রমে এর পরিসর খুবই ছোট। এ পর্যায়ে Physics, Chemistry, Math. এবং অন্যান্য Non-technical subject এত বেশি পড়ানো হয় যে, বিষয়টা হয়ে যায় Versatile. তবে Msc এবং PhD তে Specialization-টা বেশি।

ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রির একটি প্লান্ট

কোথায় পড়বেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে BUET এবং SUST-এ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের BSc, Degree দেয়া হয়। BUET-এ MSc এবং PhD করানো হয়।

উচ্চশিক্ষা

অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে খুব সহজেই ইউরোপ, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ অন্য দেশে MSc এবং P h D করার জন্য যাওয়া যায়। পর্যাপ্তসংখ্যক স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা আছে। শুধু প্রয়োজন একটি ভাল Result-এর স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে NUS (National University of Singapore) এবং Alberta University কানাডা উল্লেখযোগ্য। বাইরে পড়ুয়ারা খুব সহজেই ঐ সমস্ত দেশে চাকরি লাভ করতে পারেন।

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

চাকরি

"ধনীর ধনী কারবার" কথাটার মত বলতে হয় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা হল উন্নত দেশের জন্য উপযুক্ত যারা শিল্পে এগিয়ে রয়েছে। যেহেতু আমদানি-নির্ভর গরিব বাংলাদেশে শিল্পের সঙ্কট রয়েছে, তাই এই বিষয়ে পড়ার ক্ষেত্র ততটা এগোতে পারেনি। সরকারি চাকরিদাতাগুলোর মধ্যে BCIC Petrobangla এই Company গুলো অন্যতম। তবে BCIC'র সার কারখানাগুলো ছাড়া অন্যগুলোর অবস্থা বেশ নাজুক। বেসরকারি সেক্টরের কিছু চাকরি আছে, তবে এটা খুবই সীমিত আকারের। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে Unilever, Square, Beximco, Global Heavy chemicals Limited, Cement Industry etc. অন্যতম। তবে আশার কথা হলো, ক্রমাগত চাহিদার কারণে এবং বিশ্বের সাথে তাল মেলানোর জন্য বাংলাদেশেও বর্তমানে বেশ কিছুসংখ্যক Chemical Industry হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

Urban & Regional Planning (URP)

বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। ১,৪৪,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ক্ষুদ্র দেশে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন বাস করে শহরে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ ভাগ এবং আগামী ২০১৫ সালে শহরের মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ মিলিয়ন। বাংলাদেশের শহরগুলোতে বিশেষ করে মেগা সিটি ঢাকাতে অসহনীয় যানজট, সুপেয় পানির অপর্যাপ্ততা, ড্রেনেজ সোয়্যারেজ সিস্টেমের অব্যবস্থাপনা, লোডশেডিং, গাড়ির কালো ধোঁয়া ও শব্দে একদিকে যেমন নগরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ, অন্য দিকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দেশের এ সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নগরায়ন। প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনাবিদ।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা

বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো-

* বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
* খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও
* জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বুয়েটে পরিকল্পনা বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি যেমন মাস্টার্স, পি,এইচ,ডি করার ব্যবস্থা আছে।
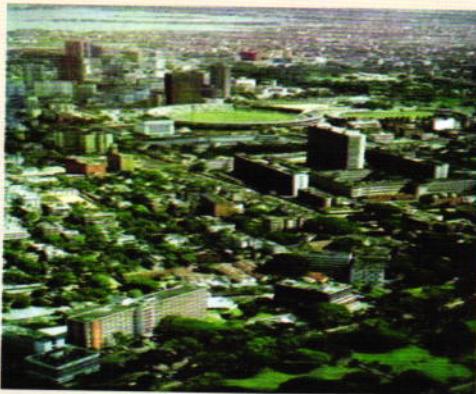
ঢাকা শহর প্লানিং -ই পারে একে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে

বিদেশে

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে এ বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্কলারশিপের সুযোগ আছে।

বিষয়সমূহ

* নগর/শহর পরিকল্পনা পদ্ধতি।
* নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
* নগরায়নের পদ্ধতি, প্রভাব।
* গ্রাম পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।
* আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
* ট্রান্সপোর্টেশন প্লানিং
* হাউজিং এবং রিয়েল এস্টেট।
* সাইট প্লানিং ও ডিজাইন।
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
* পরিবেশ উন্নয়ন।
* কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা।

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

GIS, SPSS, AUTO CAD,

WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, আরো প্রয়োজনীয় সফ্টওয়ার।

এ ছাড়াও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়েও যথার্থ জ্ঞান দেয়া হয়।

কর্মক্ষেত্র

বাংলাদেশে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ আছে। দেশী-বিদেশী সংস্থা ও এনজিও-তে কাজের সুযোগ বেশ লক্ষণীয়। তা ছাড়া কিছু ক্ষেত্র হচ্ছে-

* রাজউক
* চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (CDA)
* রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (RDA)
* খুলনা ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (KDA)
* সকল পৌরসভা
* সকল উপজেলা
* প্লানিং ডিজাইন রিলেটেড দেশী-বিদেশী ফার্ম
* হাজউজিং ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানি
* রিসার্চ অফিসার হিসেবে।
* প্রজেক্ট প্রোগ্রামার হিসেবে।

তাছাড়া অন্যান্যদের মতো প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ পেশার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।

Architecture

ভূমিকা

সৃষ্টিশীলতা, নান্দনিকতা আর Functionalism-এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পতত্ত্বের নাম স্থাপত্য। মানুষের স্বপ্নময় কল্পনার রাজ্যকে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করে কাঠামো দান করে এ স্থাপত্যকলা। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থান ও কালকে পরিকল্পিতভাবে মানুষের জন্য স্বস্তিকর, আরামদায়ক আর পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তোলাই মূলত এর মূল বিষয়বস্তু।

তাজমহল- স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব ও কালজয়ী নিদর্শন

বিষয়বস্তু

বর্তমানে আর্কিটেকচারে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Composition, Structrue, Philosophy, Mathematics, Medical Equipment, Environmental Design, Basic Planning Economics, Sociology, Physics, Urban Design, Construction Method, Sculpture এবং Working drawing. এছাড়াও রয়েছে Photography Design (conceptual), Design studio.

Design Studio হলো অন্যান্য Department-এর Practical-এর ভিন্নরূপ। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের Designing, Planning এর চেয়ে এই Studio- ভিত্তিক জ্ঞানই বেশি প্রাধান্য পায়। এখানে বিভিন্ন Project-এর Assignment দেয়ার মাধ্যমে স্থাপত্যকলার কাজের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করানোর। পাশাপাশি ঐসব বিষয়ে দক্ষ এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হয়।

চাহিদা

আর্কিটেকচার এমন বিষয় যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সুখকর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার প্রয়াস চালায়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাই এর ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়ন আর নগরায়নের এ যুগে অযাচিত আর অপরিকল্পিত পরিবর্তনকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপত্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

Interior এবং Exterior Designing-এর মাধ্যমে মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যময়, মনোরম আর প্রাকৃতিক আমেজ দেয়ার জন্য স্থপতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বাড়তি মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে যথাযথ Desing-এর plan এর ব্যবস্থা স্থপতিই করে থাকেন।

ভবিষ্যৎ

যদিও আর্কিটেকচারের ছাত্রছাত্রীদের শৈল্পিক সত্তার মধ্যে সৃষ্টিশীল চেতনাই বড় অংশজুড়ে থাকে তবুও সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধ Career গড়ার ক্ষেত্রে আর্কিটেকচার অদ্বিতীয়, অন্তত বর্তমান প্রেক্ষাপটে। পরিকল্পিত আগামী গড়ে তোলার জন্য তাই আর্কিটেক্টদের ব্যাপক চাহিদা লক্ষণীয়। চাকরির ক্ষেত্রের কথা

"সিডনি অপেরা হাউজ" -এক অনন্য সুন্দর স্থাপত্যকর্ম

বলতে গেলে বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন Multinational Company-এর কথা বলতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে এবং নিজস্ব ফার্মে Design এবং plan করে আর্কিটেক্টদের আয়-রোজগারের সুযোগ আছে। আর এ বিষয়ে পড়াশোনায় যেহেতু Design, Graphics, 3d-MAX, Auto Cad, Archi-Cad প্রভৃতি কম্পিউটারভিত্তিক কাজ শেখানো হয়, সেহেতু এগুলোর প্রয়োগ বা এগুলোর দ্বারা নতুন ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ রয়েছে।

কোথায় পড়বেন

দেশে বর্তমানে সরকারি তিনটি প্রতিষ্ঠানে Architecture পড়ানো হয়-

(ক) বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)

(খ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

(গ) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম-

(ক) এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি

(খ) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

(গ) নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি

(ঘ) স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

(ঙ) আহসান উল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি

ভর্তির যোগ্যতা

আগ্রহী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটারের ব্যবহার ও মুক্তহস্তে অঙ্কনে পারদর্শী হতে হবে। যেকোন ছবি আঁকার মত যোগ্যতা ছাড়া আর্কিটেকচারে ভালো করা অনেকটা অসম্ভব। Composition, Perspective, মুক্তহস্ত অঙ্কন, Designing, Sketch প্রভৃতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা অবশ্যম্ভাবী।

ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া

স্কলারশিপ

দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যদি GPA 3.25-এর ওপর থাকে তাহলে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় পড়াশোনা করার জন্য স্কলারশিপ পাওয়া সম্ভব। দেশেও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি দিয়ে থাকে। Credit transfer এর মাধ্যমেও অনেকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে থাকেন। দেশের চেয়ে বাইরে আর্কিটেকচারের কদর বেশি।

গবেষণা

বহির্বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে এবং আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন : মাস্টার্স, পিএইচডি প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও জাপানে মাস্টার আর্কিটেক্টদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারবেন। পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম চাকরি করার সুযোগ পেতে পারে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা।

Visit : www.architecture-jobsource.org.

স্রষ্টার সৃষ্টি
অপার বিস্ময়!
প্রথম সংস্করণ
স্রষ্টার সৃষ্টি
অপার বিস্ময়!
দ্বিতীয় সংস্করণ